পান্নাবাঈ

পান্নাবাঈ

ভারতপুত্রম্

পরেশ সাহা

ভারতী লাইব্রেরী
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৭

প্রকাশক
এ, হক
নবযুগ প্রকাশনী
২১বি, নাসিরুদ্দীন রোড
কলিকাতা-১৭

প্রচ্ছদপট
রমেন আচার্য

মুদ্রক
সন্তোষকুমার ধর
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

পাকিস্তানের পরিবেশক
নওরোজ কিতাবিস্তান
৪৬, বাংলাবাজার, ঢাকা।

দাম ৩·৫০

ডাঃ নগেন্দ্রচন্দ্র দাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু

পান্নাবাঈ

লেখকের আর একটি বই

একটি সুরের কান্না

এক

পান্নাবাঈ-এর কথা প্রথম শুনেছিলাম রসিক দত্তের মুখে।

অনেক বয়েস হয়েছিল রসিক দত্তের। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা লম্বা লম্বা চুলগুলো তার ধবধবে সাদা। মাড়ি দুটি দাঁতহীন। সেই মাড়ি বাজিয়ে ফক্‌ফক্‌ ক'রে যখন হাসত রসিক দত্ত, তখন দু'পাশের দুটি গালে তার টোল পড়ত। ঠিক টোল নয়, তখন তার দু'টি গালে যেন দুটি গর্ত দেখা যেত। সেই টোলে হাত বুলোতে বুলোতে রসিক দত্ত বলত, 'তোদের আমলে আর কি রইল রে! কি আর দেখলি তোরা! এখন সে-সব লবডঙ্কা। এদিক বাজাও—ওদিক বাজাও, শুকনো ঠনঠন! কোথাও রসের নাম-গন্ধ নেই। হ্যাঁ, শুনতিস যদি আমাদের আমলের কথা—'

'বল না দাদু, তোমাদের আমলের কথা বল না।'

গ্রাম সম্পর্কে রসিক দত্ত আমাদের সকলের দাদু। সময় সুযোগ পেলেই আমরা তার কাছে গিয়ে হাজির হতাম। তাকে ঘিরে বসতাম। বলতাম, 'এবারে তাহ'লে ভাণ্ডটি খোল দাদু।'

মিটমিট ক'রে হাসত রসিক দত্ত। ভাটার মতো বড় বড় দুটি চোখ আমাদের মুখের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বলত, 'কিসের রে? কিসের ভাণ্ড খুলবো আমি?'

'কেন, তোমার সেই রসের ভাণ্ড?'

'হুঁ, খুলছি, যা তার আগে এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়। তামাকের ধুয়া না লাগলে যে রসের ভাণ্ড খোলে না রে।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠত রসিক দত্ত। তার পাণ্ডুর মুখমণ্ডলের উপর দিয়ে যেন একটা হাসির ঢেউ খেলে যেত।

আমি উঠতাম। দৌড়ে গিয়ে তামাক সেজে আনতাম। থেলো হুঁকোয় গুড়ুক গুড়ুক টান মেরে গল্প শুরু করত রসিক দত্ত। যেন ডুবে যেত। গল্পের মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলত।

আমরা হাঁ করে তার প্রতিটি কথা গিলতাম।

াকা 'হুঁ'—

কেবল এই 'হুঁ' ছাড়া আর কোন কথা বলতাম না। কলকের ডগাটা জুড়িয়ে এলে মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে শুধু তামাক ভরে আনতে হতো। হ্যাঁ, এই পর্যন্তই। রসিক দত্ত একটানা গল্প চালিয়ে যেত। তামাক আর গল্প পেলে তার আর কোন কথা মনে থাকত না। তার মুখেই প্রথম পান্নাবাঈ-এর কথা শুনেছিলাম।

সেদিনের কথাটা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। বোধ হয় শ্রাবণের মাঝামাঝি। ক'দিন ধরেই বৃষ্টি চলছিল একটানা। পথ-ঘাট জল-থইথই। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে, পুকুরে, ডোবায় ব্যাঙের ঐকতান। বাইরে বেরোবার উপায় ছিল না। কখন আবার ঝপঝপ ক'রে বৃষ্টি নামে তার ঠিক নেই। কাজেই বন্দী। সারা দিন ঘরে বন্দী। ঘরে বসে বসে মনটায় একেবারে যেন জং ধরে গিয়েছিল। হঠাৎ কি খেয়াল হলো, পাশের বাড়ীর পটলাকে নিয়ে গিয়ে হাজির হলাম দাদুর কাছে।

বাইরের উঠোনের একখানি চৌকিতে বসেছিল রসিক দত্ত। বসে বসে ঝিমচ্ছিল। রোজ বিকেলে সে আফিং সেবন করত। কে জানে আজকের মাত্রাটা একটু চড়া হয়েছিল কি না?

আমাদের শব্দ পেয়েই সে চোখ মেলে চাইল।

বলল, 'কে? পুঁটু! পটলা!'

'হ্যাঁ, দাদু! একা একা বসে কি করছো?'

'একা নয় তো দো'কা পাবো কোথায় রে! ক'দিন ধরে শালা আকাশের যে কি রোগ ধরেছে, তাতে তো আর কোথাও বেরোবার উপায় নেই। আয়, আয়, বোস এ পাশটায়। তোদের সঙ্গে কথা-টথা বলে মনটাকে যদি একটু চাঙ্গা করতে পারি।' বলেই সেই ফিকফিক ক'রে হাসল রসিক দত্ত। তার দু'পাশের দুটি গালে আবার সেই টোল পড়ল।

'ওঃ, বাপস্, হাত পা-গুলো একেবারে যেন নিসপিস করছিল একেবারে যেন বাতে ধরে ফেলেছিল আর কি!'

বসতে বসতে আমি বললাম।

আমার কথায় আবার হাসল রসিক দত্ত। বলল, 'কি, তোদের স হলো কি রে পুঁটু! অ্যা, বলি হলো-টা কি? এই তো মাত্তর কচি বয় তোদের। লাউ ডগার মতো ফনফনিয়ে উঠছিস। এ বয়সে জল-বৃষ্টি আবার ভয়টা কিসের? বলি ভয়টা কিসের! আমাদের আমলে কিন্তু—

বুঝলাম দাত্বকে নেশায় পেয়েছে। গল্পের নেশায়। এখন এক ছিলিম তামাক না হলে আর তা জমবে না।

পটলাকে ইঙ্গিত করতেই সে উঠে গিয়ে তামাক সেজে আনল।

তামাক পেয়ে তো মহাখুশী রসিক দত্ত।

বলল, 'বাঃ বাঃ—এক্কেবারে যেন বুদ্ধির ঢেঁকি এক-একটি। এমনি না হলে হয়? তা যেন কি বলছিলাম রে পুঁটু?'

'তোমাদের আমলের কথা দাত্ব।' আমি সূত্র ধরিয়ে দিলাম।

ত্বটি চোখ বুজে, গুড়ুক গুড়ুক ক'রে হুঁকোয় তিনটি টান মার্‌ল রসিক দত্ত। ধোঁয়ার খানিকটা গলাধঃকরণ করল। খানিকটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ আমাদের আমলের কথা। আমাদের আমলে কিন্তু ঐ জলটল কিছুই গেরাহ্যির মধ্যে আনতাম না, বুঝ্‌লি? ও সবকে মোটেই পরোয়া করতাম না।'

'ইস্!'

পটলা ঠোঁট ত্বটিকে গোল ক'রে একটা শব্দ করল।

রসিক দত্ত বলল,—'ইস্? পটলা, তুই বলছিস ইস্? আজ যদি বেঁচে থাকত তোর ঠাকুর্দা দানবন্ধু তাহলে হাতে হাতে প্রমাণ ক'রে দিতাম কথাটা। এই তো সেবার—হবে সেটা বিশ বাইশ সাল। একটানা জল-ঝড়ের যেন আর বিরাম নেই। আকাশ মেঘে ঢাকা। সারাদিন সূয্যিঠাকুরের মুখটি আর দেখা গেল না। সন্ধ্যার দিকে এক হাঁটু জল ভেঙে দীনবন্ধু এল। দীনবন্ধু—পটলা তোর ঠাকুর্দা দীনবন্ধু রায়। বলল—তা হলে বেপারটা কেমন হলো হে ওস্তাদ!—দীনবন্ধু আবার আমায় ওস্তাদ বলে ডাকত।'

'কেন কি হলো আবার?' দীনবন্ধুর কথার নাড়ী ধরতে না পারলেও বললাম আমি।

'এ ঝড়-জলে তা হলে বেরোই কি ক'রে? ধলেশ্বরী যে একেবারে ফোঁসফোঁস করছে।'

'কেন নৌকায় যাবো, ঝড়-জলে আমাদের কি করবে? আর ধলেশ্বরীর ফোঁস-ফোঁসানীকে কে ভয় করে? ঐ রাক্ষসীর সঙ্গে লড়াই ক'রেই না আমরা টিকে আছি?'

যাবো ঢাকায়। পান্নাবাঈ আসছে। লক্ষ্ণৌর বাঈজী পান্নাবাঈ। কোকিল কণ্ঠী। রূপসী।

রূপ আর কণ্ঠ এই দুটি সম্পদ দিয়ে সারা ভারতকে সে জয় ক'রে ফিরছে। সেই বিজয়িনী পান্নাবাঈ ঢাকায় আসছে। রায় বাড়ীতে। কাল সন্ধ্যায় তার আসর বসবে। রায়দের নাচঘরে। বন্ধুবান্ধব এদিকে সেদিকে দু' চারজন যা ছিল তাদেরও নিমন্ত্রণ করেছে রায়বাবুরা। রায় বাড়ীর মেজোবাবু গুণদাচরণ রায়ের সঙ্গে তখন আমাদের খুবই মাখামাখি। সেই সূত্রে নিমন্ত্রণ আমরাও পেয়েছিলাম। কিন্তু রাতারাতি নৌকায় না চাপলে সময়মতো গিয়ে ঢাকায় পৌঁছতে পারবো না। দীনবন্ধুর আশঙ্কাটা সেইখানেই।

দীনবন্ধু বলল, 'এই উথালপাথাল গাঙে মাঝিরা নাও ধরতে রাজী হবে তো?'

'হু, কি যে বল তুমি, নাও ধরবে না ধলেশ্বরীর মাঝিরা! এ্যাদ্দিন ওদের সঙ্গে সঙ্গ ক'রেও ওদের চিনলে না দীনু। সাপুড়েরা যেমন সাপ নিয়ে খেলতে ভালবাসে, ঢেউ-এর ঝুঁটি ধরে নাচতেও ধলেশ্বরীর মাঝিদের তেমনি আনন্দ।'

'তাই বলে এই রাত্তিরে—'

দীনবন্ধু প্রশ্ন তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে দিই নি আমি। মাঝখানেই থামিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, রাত্তির হলেই বা ভয় কিসের? অন্ধকার হাঁ ক'রে গিলে ফেলবে নাকি? ধলেশ্বরীর মাঝিদের, বুঝলে দীনবন্ধু, ঐ রাত্তির-দিনের বিচারটি নেই। দিন আর রাত্তির তাদের কাছে দুই-ই সমান।'

দীনবন্ধু আর কথা বাড়ায় নি। সেদিন নতমস্তকে ওস্তাদের কথাই মেনে নিয়েছিল সে।

গিয়েছিলাম। সেই রাতেই রওনা হয়েছিলাম। আকাশ তখনও গুমগুম করছে। বৃষ্টি পড়ছে ঝম্‌ঝম্। মাঝে মাঝে একটা আর্ত চীৎকার ক'রে আকাশের বুকটা যেন জ্বলে উঠছে। ধলেশ্বরী ফুলছে। ধলেশ্বরী ফুঁসছে। কী একটা আক্রোশে যেন ফেটে পড়ছে ধলেশ্বরী। শতশত ফণা তুলে সে তীরের দিকে ছুটে আসছে। তীরকে ছোবল মারতে আসছে। তীরের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে যেন তার চিরকালের শত্রুতা। কিন্তু বুকের পাটা বটে মাঝিদের! ধলেশ্বরীর সেই উদ্ধত ঝুঁটির উপর দিয়ে নাচতে নাচতে তারা নাও নিয়ে ছুটলো, বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা গান জুড়ে দিল।

—ও মাঝিরে—মাঝিরে···

ঢেউ-এর মাথায় নাচি আমি, কইলজায় নাচে খুন,
(ও আমার) মন নাচে আর যৈবন নাচে
(নাচে) যৈবনের আগুন ॥
মাঝিরে··· মাঝিরে···।

দীনবন্ধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কুপির আলো পড়ে তার দুটি চোখ চকচক করছে। মাঝিদের গান সে উপভোগ করছে। নাও-এর পাটাতনে সে তাল ঠুকছে ঠকঠক ক'রে।

'ওস্তাদ !'

'বলি কেমন ? লাগছে কেমন ?'

'তোফা ! তোফা !' বলে দীনবন্ধু মাথা ঝাঁকিয়ে পাটাতনের উপর জোরে একবার তাল দিল।

আমি বললাম, 'ধলেশ্বরীর মাঝিদের এবারে তাহলে চিনলে দীনবন্ধু ?'

'চিনেছি, খুব চিনেছি। অনেক আগে থেকেই চিনেছি। তবে···তবে—জানলে কি ওস্তাদ, মাঝে মাঝে মনটা যেন এই একটু—কেমন কেমন হয়ে যায়।' বলে দীনবন্ধু নিজেই খলখল ক'রে হেসে উঠল।

নাও তখন মাঝ ধলেশ্বরীতে। বাতাসের ধমকে হেলছে-দুলছে। আমি বললাম, 'ধলেশ্বরীর মাঝিদের সারাটা জীবন এই ধলেশ্বরীর সঙ্গেই খেলা। ধলেশ্বরীরই জল-হাওয়ায় মানুষ তারা। কাজেই পাগলী ধলেশ্বরী খেপে গিয়ে তার মাথার জট নাচাতে নাচাতে এগিয়ে এলেও তা দেখে এদের কেউ ভয় পায় না। বরং ধলেশ্বরীর জেদ দেখে এদের জেদও বেড়ে যায়। তখন নদী আর মানুষে লড়াই বাধে। তাতে কখনও মানুষ জেতে, কখনও নদী। আর নদী জিতলেও ধলেশ্বরীর মাঝিদের কোন মতেই কাবু করতে পারে না। ধলেশ্বরীর ঢেউ-এর মাথায় ঘুষি মারতে মারতেই তারা সাঁতরে এসে তীরে ওঠে। নদীর সঙ্গে আবার তারা নতুন ক'রে লড়াই-এর জন্য তৈরী হয়।

'ধলেশ্বরীর দেশের মানুষ তো আমিও, সে কথাটা একেবারেই ভুললে নাকি গো ?'

'না, তা ভুলবো কেন, তা ভুলবো কেন ! তবে তুমি মাঝে মাঝে—'

আমার কথা ফুরুল না। ঠোঁট থেকেই যেন কথা কেড়ে নিলে দীনবন্ধু।

বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঐ তুমি ঠিক ধরেছো। মাঝে মাঝে মনটা আমার কেমন যেন নরম নরম হয়ে যায়। তখনই—বুঝলে না, সেই তখনই বুকটা কেমন যেন দপ্‌দপ ক'রে ওঠে।' বলে দীনবন্ধু আবার হাসল।

মাঝিদের গান তখনও শেষ হয় নি। তাদের দরাজ কণ্ঠের সুর ঝড়ো হাওয়ায় নাচতে নাচতে যেন এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের বুকের তলায় সত্যি যেন 'যৈবনের আগুন' জ্বলে উঠেছে।

নাও চলেছে। উথাল-পাথাল ধলেশ্বরীর জল কেটে কেটে নাও চলেছে।

পরদিন যথাসময়ে গিয়ে হাজির হলাম। রায়দের নাচঘরে খুব বেশী একটা লোক ছিল না। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা কম। তাছাড়া তখনও সবাই এসে উপস্থিত হয় নি। ছেঁড়া ছেঁড়া ছোট ছোট জটলা ছিল এখানে সেখানে। মেজোবাবু গুণদাচরণ রায় আমাদের দেখে তো মহাখুশী।

'এসেছো?'

'তা আপনি যখন ডেকেছেন তখন না এসে আর করি কি? তাছাড়া পান্নাবাঈ এসেছে—ভারত-বিজয়িনী পান্নাবাঈ। তার কণ্ঠে গান শুনবো, সে কি আর কম সৌভাগ্যের কথা!'

'না, না, বেশ করেছো। বেশ করেছো। কিন্তু গান শুনেই পালিযে যেয়ো না যেন। আমার সঙ্গে দেখা করো, কথা আছে।' বলে গুণদাচরণ রায় তাঁর হাতের ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে অন্য দিকে চলে গেলেন।

আমরা আসরে বসলাম। খুব সুন্দর ক'রে সাজানো আসরটি। আলো ঝলমল। ও-পাশে ভারতেশ্বরী মহারাণীর একখানি তৈলচিত্র টাঙানো। এ-পাশে রাজা-রাণীর আরও ক'খানি ফটো। তাছাড়া নীলবসনা সুন্দরী, হাসির রাণী প্রভৃতি নানা ধরনের নগ্ন, অর্ধনগ্ন ছবির মেলা। তার মাঝে মাঝে রায়দের পূর্বপুরুষের বড় বড় ক'খানি তৈলচিত্রও আছে। মাথার উপর ঝাড় ফানুস দুলছে। জ্বলছে। কখনও কখনও আলোর দ্যুতি দেয়ালের গায়ে পড়ে জোনাকি আলোর মতো চিকচিক করছে। ঝাড়ের কাঁচগুলো বাতাসে দুলে দুলে কখনও আবার ঠুনঠুন ক'রে বাজছে।

এল পান্নাবাঈ।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। নাচঘরের সব বাতি জ্বলে উঠেছে। আলোর

বন্যা যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে আসরের উপর। সেই চোখ ঠিকরে যাওয়া আলোর ঔজ্জ্বল্যে আসরে এসে দাঁড়াল পান্নাবাঈ। বয়স আর কত হবে? চব্বিশ-পঁচিশের বেশী নয়। কিন্তু গড়নটা একটু বাড়ন্ত। তাই বয়সটা আসলে কত তা ঠিক ক'রে বলবার উপায় নেই। কিন্তু পান্নাবাঈ রূপবতী। তার পরনের সালোয়ার আর বুকপট্টি ভেদ ক'রেও সে রূপ ফুটে উঠেছে। যৌবনে তার দেহ কাণায় কাণায় পূর্ণ। এই যৌবনের গরবে সে রূপ আরও যেন অপরূপ হয়ে উঠেছে।

সোনামাজা গায়ের রং পান্নাবাঈ-এর! মুখের আদলটি সুন্দর। তার চেয়েও সুন্দর হলো তার টানা টানা আশ্চর্য দুটি চোখ। সেই আশ্চর্য দুটি চোখের দৃষ্টি মানুষের হৃদয় ভেদ ক'রে তার গোপন খবরটি পর্যন্তও যেন নিয়ে আসতে পারে। মৃদু পাতলা একটা সুর্মার রেখায় সেই আশ্চর্য দুটি চোখকে আরও যেন রহস্যঘন ক'রে তুলেছে পান্নাবাঈ। পিঠের দু'পাশে সাপের মতো দুলছে দুটি বেণী, সিল্কের ছিল্‌কা জড়ানো। সেই বেণীর শেকলে শেকলে গোঁজা ক'টি গোলাপ ফুল। সাদা গোলাপ। সে বেণীর সৌন্দর্যকে যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

বলতে লজ্জা নেই ভাই, ভারত-বিজয়িনী বাঈজী পান্নাবাঈ-এর মুখের দিকে হাঁ ক'রে সেদিন তাকিয়েছিলাম আমি। আমার অবস্থা দেখে আশে-পাশের দু'চারজন ভদ্রলোক একটু মুচকি হেসেছিলেন। একজন তো তাঁর পাতলা গোঁফ-জোড়া নাচাতে নাচাতে রহস্য ক'রে বলেছিলেন, 'দেখবেন মশাই, অমন হাঁ ক'রে থাকবেন না। এখানে বড় পোকা-মাকড়ের উপদ্রব—।'

সংযত হলাম। একটু যেন লজ্জাও পেলাম। পান্নাবাঈ-এর দুটি আশ্চর্য চোখের গভীরে আমার যে মন ডুবে গিয়েছিল, সে মনকে আবার টেনে তুললাম।

দীনবন্ধু আমার পিঠে আলতোভাবে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'বলি হলো কি হে ওস্তাদ, বলি হলোটা কি? একেবারে যেন গলে গেলে তুমি।'

দীনবন্ধুর দুটি ঠোঁট হাসিতে ছড়িয়ে গেছে। দুটি চোখ নাচছে। দুটি গালেও যেন হাসির রং ধরেছে।

আমি বললাম, 'দীনু···দীনবন্ধু!'

'ওস্তাদ!'

'না, পরে বলবো, এখন নয়।'

পান্নাবাঈ গান আরম্ভ করেছে।

সুবাসিত নাচঘর। বড় বড় বাবু-ভুঁইয়ারা দামী দামী এসেন্স মেখে এসেছে। আতর-ভেজা তুলো গুঁজেছে কানে। তারই গন্ধ ম' ম' করছে নাচঘরে। তাছাড়া ঘরময় ছড়ানো হয়েছে গুলাব জল। সেই গুলাব জলে মাখা বাতাস যেন ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে বইছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লীলায়িত ভঙ্গীতে গান গাইছে পান্নাবাঈ।

কাহে মারে নাজারিয়া
শ্যামলিয়া রে—
কাহে মারে নাজারিয়া।
এহি পার গঙ্গা ওহি পার যমুনা
বীচ মে ঠৈরি হ্যায় কানাইয়া ॥

সেই সুরের তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে নাচঘরের দেয়ালে দেয়ালে। আছড়ে পড়ছে উন্মুখ শ্রোতাদের কানে কানে। মাঝে মাঝে 'বহুৎ আচ্ছা' 'আচ্ছা আচ্ছা' 'মধু মধু' প্রভৃতি রসঘন ধ্বনিতে গুণমুগ্ধ শ্রোতারা বাঈজীকে অভিনন্দিত করছে। সে অভিনন্দনে পান্নাবাঈ-এর বুক যেন ফুলে উঠছে। সুরের দমক চড়ে গেছে। সারিঙ্গীদাররা তার সঙ্গে তাল রেখে সারিঙ্গী বাজিয়ে চলছে। কিন্তু—

কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন থেমে গেল রসিক দত্ত। তার দরাজ গলাটাও যেন ধরে এল। দুটি চোখ বুঝি টলটল ক'রে উঠল। কিন্তু না, একটু পরেই যেন ঘোর কাটল তার। দুটি চোখ মুছে নিল সে। গলাটাও তার আবার যেন ঝনঝন ক'রে উঠল। রসিক দত্ত আবার আরম্ভ করল, কিন্তু আমার দিকে চোখ পড়তেই চকিতে চোখ ফিরিয়ে নিল পান্নাবাঈ। হঠাৎ তার গলা কেঁপে উঠল। ভারত-বিজয়িনী পান্নাবাঈ-এর গানের যেন তাল কাটল। হঠাৎ গান বন্ধ ক'রে বসে পড়ল সে। উৎসুক শ্রোতারা বিস্মিত হলো। সারিঙ্গীদারদের একজনকে কাছে ডেকে পান্নাবাঈ বলল, 'সফরদার, বাবুদের বলে দাও, আজ আর গান হবে না। আমার শরীর ভালো নেই।'

'কি হলো বাঈজী, কোন দিন যা হয় নি, আজ কেন তা হলো? কেন তোমার গানের তাল কাটল?'

'সে তুমি বুঝবে না সফরদার, সে তুমি বুঝবে না। সে কথা কাউকে বলা যায় না।' বলে পান্নাবাঈ একজন লোক নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

আসরে একটা গুঞ্জন উঠেছিল। একটা কলরব উঠেছিল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। একটু পরেই সব চুপচাপ। একটু পরেই রায়বাবুদের নাচঘরে একটা নীরবতা নেমে এল। লোকজন সব চলে গেল।

কিন্তু আমি যাই নি। হয়তো যেতে পারি নি। আমার চোখের সামনে সব যেন ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। ভাবছিলাম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান্নাবাঈ-এর কথাই ভাবছিলাম। একটা বেদনা বুকের বাম পাশটায় মোচড় দিয়েই শিরশির ক'রে মাথায় গিয়ে উঠছিল। চোখ দুটিতে ভীষণ জ্বালা। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে চোখ দুটি মুছে নিলাম।

দীনবন্ধু বলল, 'যাবে না ওস্তাদ, রাত যে মেলাই হলো গো!'

'ওঃ, চলো যাচ্ছি!'

'ওস্তাদ!'

'বলো!'

'তখন কি বলছিলে গো ওস্তাদ!'

'না থাক, এখন নয়। সে কথা পরে হবে।'

'পরে?'

একটা হতাশার সুর খেলে গেল দীনবন্ধুর কণ্ঠে। কি যেন ভেবে একবার হাসলও দীনবন্ধু।

বলল, 'তুমি না কইলেও ব্যাপারটি কিন্তু আমি ঠাহর করতে পেরেছি?'

'তুমি—!'

বলতে গিয়ে গলাটা একবার যেন কেঁপে উঠেছিল। তবুও বললাম। একটা বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম দীনবন্ধুর মুখের দিকে।

আমার অবস্থা দেখে আবার হাসল দীনবন্ধু। তার দুটি চটুল চোখও যেন হেসে উঠল তার সঙ্গে।

হেসে হেসেই সে বলল, 'বুঝেছি গো, বুঝিছি, এটুকুই যদি না বুঝবো, তাহলে এ্যাদ্দিন তোমার সাকরেদি ক'রে ম'লাম কেন?'

আমি বললাম, 'তুমি আবার কি বুঝলে দীনবন্ধু?'

'বুঝেছি গো, আমি ঠিকই বুঝেছি। বাঈজী তোমার পেয়ারের লোক— তোমার মহব্বতের ময়না। বাঈজীর কাছে তুমি—

'দীনবন্ধু!'

'ওস্তাদ?'

'যে কথা কেউ জানে না। তুমি সে কথা কি ক'রে জানলে দীনবন্ধু! কে তোমায় সে কথা বললে?'

'বলেছে—'

বলতে গিয়ে হঠাৎ হাসল দীনবন্ধু। আমার মুখের উপর দিয়ে তার ছুটি চটুল দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে নিল। তারপর বলল, বলেছে গো, তোমার চোখ বলেছে। তোমার মুখ বলেছে। তোমার মুখে যে সে কথা লেখা আছে। আমি খুব ভালো ক'রে সে কথাটাই পড়ে নিয়েছি।'

বলে একেবারে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল দীনবন্ধু। কি একটা রহস্য যেন তার চোখের পাতায় ঝকঝক ক'রে উঠল।

পান্নাবাঈ! পান্নাবাঈ! লক্ষ্ণৌর বাঈজী পান্নাবাঈ! ভারত-বিজয়িনী পান্নাবাঈ। সে পান্নাবাঈ আমার পরিচিত। শুধু পরিচিত নয়, পান্নাবাঈ আমার স্মৃতির স্বপ্ন—আমার প্রথম যৌবনের লীলায়িত লীলাসঙ্গিনী। পান্নাবাঈ নয়—আমার গোলাপ। আমার হৃদয় রঙে রাঙানো রক্ত গোলাপ। আমার যৌবন বৃন্তে ফোটা গোলাপ। আমার গোলাপ ফুল। আজও যাকে স্বপ্নে দেখি। আজও যার স্পর্শে আমি ঘুমের ঘোরে চমকে উঠি, যার কথা ভাবতে গিয়ে কত ঘুম-ভাঙা রাত আমার চোখের জলে নেয়ে ওঠে—সেই গোলাপ আমার এত কাছে!—আমার চোখের সামনে! তার সঙ্গে তো সাক্ষাৎ না ক'রে যাওয়া যায় না। তাকে তো না বলে যাওয়া যায় না, গোলাপ তুমি ফুটেছো, আর আমি কুঁড়িতেই ঝরে গেছি। গোলাপ তুমি বিজয়িনী, আর আমি ফতুর হয়েছি, হেরে গেছি। গোলাপ তুমি চোখের জলে প্রাণ পেয়েছো—লাল হয়েছো, আর সেই চোখের জলই আমার কাল হলো গোলাপ, সেই চোখের জলেই আমি ডুবে ম'লাম।

রাত হয়েছিল। রায়দের নাচঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই কথাগুলোই বার বার ভাবছিলাম। বাইরে নীল নির্জন আকাশ। তারার চুমকি-পরা যেন একখানি দীর্ঘ নীল শাড়ি। সেই তারা ঝলমল আকাশের দিকে চেয়ে

চেয়ে দু' চোখ বেয়ে কখন যেন ক' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল। খেয়াল ছিল না। খেয়াল হলো দীনবন্ধুর ডাকে।

'ওস্তাদ !'

দীনবন্ধু দূরে ছিল। এগিয়ে এল। আমার পিঠে আলতোভাবে তার ডান হাতখানা রেখে বলল, 'মনটা তোমার ভারি খারাপ না গো ওস্তাদ !'

আমি কথা কই নি। কইতে পারি নি।

'তা একটু ঘুরে ফিরে এসো না, বাঈজীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষেৎটা সেরে এসো না, আমি বরং সদর ঘাটের দিকটায় যাই, তুমি ফিরলে ডেকো।'

'তাই ভাবছি।'

'না, না, এর মধ্যে আর ভাবাভাবির কি আছে। ঐ যে পেল্লাদ সাধু গান গায় না। 'মনের মানুষ পেলে পরে, মন পাগলা কি থাকে ঘরে !' বুঝলে না গো ওস্তাদ, মনের মানুষ পেলে মন পাগলা আর ঘরে থাকে না। আর তা থাকা ঠিকও নয়।' বলে চোখ ঠেরে একবার মুচকি হেসে দীনবন্ধু বেরিয়ে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

নাচঘরের পুবদিকে ছোট্ট একফালি জমি। জমির পরে ছোট্ট একটি দীঘি। দীঘির পুব পাশে রায়দের হাওয়া-মহল। সেই হাওয়া-মহলেই উঠেছে পান্নাবাঈ। নাচঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়া-মহলটি স্পষ্ট দেখা যায়।

এবারে সেই হাওয়া-মহলের দিকেই চাইলাম।

আলোর প্রাচুর্য নেই, বোধ হয় সাদা-সিধে একটা লণ্ঠন ঝুলছে হাওয়া-মহলে। তাতে অন্ধকার একেবারে কাটে নি। কেমন যেন রহস্যভরা একটা আলোছায়ার খেলা। সেই আলোছায়ার মাঝেই রয়েছে পান্নাবাঈ। মনে মনে হয়তো কত কথাই ভাবছে !

এগিয়ে গেলাম। জমি ছাড়িয়ে দীঘির পার ধরে সোজা গিয়ে হাওয়া-মহলে উঠলাম।

লোকজনের সাড়া নেই, হাওয়া-মহল যেন শূন্য। কেবল দখনে হাওয়া-মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাওয়া-মহলকে আলিঙ্গন করছে।

'গোলাপ !'

উত্তর নেই।

'গোলাপ !'

এবারেও উত্তর এল না। আমার ব্যাকুল কণ্ঠ হাওয়া-মহলের কার্নিশে কার্নিশে বাড়ি খেয়ে কেবল ঝমঝম ক'রে উঠল।

আবার ডাকলাম, 'গোলাপ !'

'কে ?'

ভেতরে ঢুকলাম। বললাম, 'আমি, আমি গোলাপ।'

আসর থেকে ফিরেই পান্নাবাঈ এসে বিছানা নিয়েছিল। সাজ-সজ্জা খোলে নি। বেণীর ফুলগুলো পর্যন্ত ঝরে নি। কোমল দুটি বাহুলতার ফাঁকে মাথাটি গুঁজে এতক্ষণ ফুলে ফুলে কাঁদছিল পান্নাবাঈ। আমার ডাকে হয়তো উঠে বসেছে। চোখের জলে আপেল লাল দুটি কপোল চিকচিক করছে। বেণীর শিথিল বন্ধনী থেকে কয়েকটি চুল উড়ে এসে লেপটে গেছে সেখানে। লণ্ঠনের ম্লান আলোকে পান্নাবাঈ-এর টানা টানা দুটি আশ্চর্য চোখের দিকে চাইলাম।

পান্নাবাঈ চোখ ফিরিয়ে নিল। বলল, 'তুমি ! তুমি এখানে কেন ?'

'গোলাপ !'

'না, না, তুমি যাও, আমার সমুখ থেকে সরে যাও।'

'গোলাপ, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। অনেক কথা।'

'কোন কথা নেই, তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাইনে।'

'গোলাপ, একদিন ভুল ক'রে তোমায় কাঁটার মাঝে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। তুমি সেই কাঁটা থেকে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছো। কিন্তু তাই বলে আমার সেই ভুলটাকে, সেই কাঁটার আঁচড়টাকেই কি চিরকাল মনে ক'রে রাখবে? তোমায় আঘাত দিতে গিয়ে কত বড় আঘাত যে আমি নিজে পেয়েছি সে কথাটা কি একবারও তুমি বুঝবে না গোলাপ ?'

পান্নাবাঈ নিরুত্তর।

'গোলাপ, কথা কও গোলাপ। আমার কথার জবাব দাও।'

পান্নাবাঈ মুখ ফিরিয়ে নিল।

'গোলাপ, তুমি বিশ্বাস করো, তোমায় আমি খুঁজেছি। গত বারোটি বছর তোমার জন্যে আমি ঘুম ভুলেছি। আকাশের তারার চোখে আমি তোমার চোখ দেখেছি।'



পান্নাবাঈ আবার বিছানায় এলিয়ে পড়ল। বাহুলতার আড়ালে আবার নিজের মুখ ঢাকল।

'লোকে বলেছে তুমি মরেছো গোলাপ। গলায় কলসী বেঁধে বংশীনদীর জলে ডুবে মরেছো। কত দিন কত রাতে বংশীর উপর দিয়ে নৌকোয় যেতে যেতে বংশীর জলে আমি আমার চোখের জল ঢেলেছি। কত দিন ভেবেছি, বংশীর জলে একদিন আমিও আমার বুকের জ্বালা জুড়োব।'

এবারে আর চেপে থাকতে পারল না পান্নাবাঈ। সজোরে কেঁদে উঠল। বলল, 'ওগো, ঢের শুনেছি। আর শুনতে চাইনে। এবারে তুমি যাও। আমাকে—আমাকে বাঁচতে দাও। আমাকে বাঁচতে দাও।'

'আচ্ছা, তা হলে যাই। চলেই যাই গোলাপ। তুমি যখন চাইছো তখন চলেই যাই।'

বলতে বলতে এগোলাম। কিন্তু পা চলছে না। গা'টা কাঁপছে। থামলাম। গোলাপের দিকে আবার খানিকটা এগিয়ে এসে বললাম, 'গোলাপ, যাই। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা তোমায় শুনিয়ে যাই গোলাপ, সে কথা তোমায় না শোনাতে পারলে বুকটা আমার কিছুতেই হালকা হবে না।'

পান্নাবাঈ নিরুত্তর।

আমি থামলাম না। বললাম, 'গোলাপ, সেদিন শেষরাতে সোনাক্ষেত থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। যাবার আগে একবার তোমায় দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। তোমাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে গিয়েও ছিলাম। কিন্তু ডাকতে পারি নি। সাহস হয় নি। মনে মনে জ্বলে মরেছি। মানুষের জন্যে মানুষের প্রাণ যে অমন ক'রে জ্বলে, সেদিনই প্রথম তা বুঝতে পেরেছিলাম। সেদিন—'

কথা শেষ হলো না। কান্না-ভেজা কণ্ঠে পান্নাবাঈ বাধা দিল। বলল, 'না, না, আর না। আর শুনতে চাইনে। তুমি যাও। ওগো যাও। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি যাও। এখনই ওরা এসে পড়বে। তা হলে আমার আর লজ্জার শেষ থাকবে না।'

আর দাঁড়ালাম না। বাইরে বেরিয়ে এলাম। সারা দেহে একটা যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। ফুর্‌ফুরে দখনে হাওয়া বইছে। বাতাসে দীঘির টলটলে জলের স্বাদ। তবুও যেন ঘামে একেবারে নেয়ে উঠলাম। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে আর একবার পেছন ফিরে চাইলাম। জানালা দিয়ে সবই দেখা গেল। খাটের উপর পান্নাবাঈ আগের মতোই পড়ে

আছে। কি একটা গভীর জ্বালায় সে যেন ছটফট ক'রে মরছে। দু' চোখে অঝোরে জল ঝরছে। কাঁদছে। ভারত-বিজয়িনী পান্নাবাঈ কাঁদছে।

হঠাৎ আমার যেন কি হলো। আবেগে আবার ডেকে উঠলাম, 'গোলাপ!'

আর তার কোন উত্তর এল না।

পরদিন রায়বাড়ীতে গিয়ে খবর পেলাম, পান্নাবাঈ নেই। এবারের সকল চুক্তি খেলাপ ক'রে কালকের শেষরাতেই পান্নাবাঈ লক্ষ্ণৌর পথে রওনা হয়েছে।

দুই

কে এই গোলাপ? কি ক'রেই বা সে পান্নাবাঈ হলো—রসিক দত্তের মুখে একদিন সে কথাও শুনেছিলাম। আশ্বিনের এক চাঁদনি রাতে খোলা ছাদে বসে সব কথাই খুলে বলেছিল রসিক দত্ত। বলতে বলতে এতদিন পরেও তার ছানি-পড়া ছুটি চোখ ছলছল ক'রে উঠেছিল।

বলেছিল: মানুষের বাইরেটা দেখে মানুষকে কখনও বিচার করিস নি পুঁটু, মানুষের অন্তরেই আছে মানুষের সত্য পরিচয়। যদি কোনদিন কোন মানুষকে বুঝতে চাস্, তাহলে তার খুব কাছে বসে তার অন্তরের দরজাটা একবার খোলবার চেষ্টা করিস। তাহলে দেখবি, বাইরের সব কিছু সাজ-সজ্জা খুলে ফেলে মানুষের অন্তরের সত্য মানুষটি তার আসল রূপ নিয়ে তোর চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রসিক দত্ত সেদিন সত্যি তার অন্তরের দরজাটা আমার কাছে খুলে ধরেছিল। সেদিন তার মধ্যে আমি একজন অনুতপ্ত প্রেমিকের ছবি লক্ষ্য করেছিলাম। তার টলটলে ছুটি চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনটাও বুঝি টলটল ক'রে উঠেছিল। তাই বেশী কথা কইতে পারি নি। কেবল রসিক দত্তের ব্যর্থ প্রণয়ের করুণ কাহিনীটি বুকে পুরে সেদিনের মতো চলে এসেছিলাম।

সেদিন ছুটি চোখে আর ঘুম নামে নি।

গাঁয়ের নাম সোনাক্ষেত। সোনার ক্ষেত তো দূরের কথা, গাঁয়ের চার পাশে ধান-কলাই-এর ক্ষেতও কোথাও নেই। সোনাক্ষেতের ক্রোশ দেড়েক দূরে বনগ্রাম। চাষী পল্লী। এই চাষী পল্লী বনগ্রামের পর থেকেই চাষীদের সব ক্ষেত-খামার। সোনাক্ষেতের ছু'চার ঘর লোকের যা চাষের জমি আছে তা-ও সেই বনগ্রামের পরেই। তা ছাড়া সোনাক্ষেতের অধিকাংশ লোকই ব্যবসায়ী। সপ্তাহে এখানে ছুটি হাট বসে। শনিবার আর মঙ্গলবার। বহু যোজন দূরের পথ মেরেও লোক আসে এই হাটে। সোনাক্ষেতের লোকও হাটে যায়। 'রামে রাম, রামে ছুই, রামে তিন' প্রভৃতি অঙ্ক সুর ক'রে মুখে

উচ্চারণ ক'রে তারা ধনে, চন্দনী, মটর ওজন করে। কেনে। 'রাখী' করে। কারো কারো আছে পানের কারবার। কেউ কেউ করে কাপড় বা মুদি-মসলার দোকান। গাঁয়ে চাকরিজীবী যে কেউ নেই তা নয়। আছে। তারা ঢাকা বা কলকাতায় চাকরি করে। কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজন থাকে গাঁয়ে। কাজেই ছুটিছাটা পেলেই তাদের গাঁয়ে চলে আসতে হয়। তাদের সঙ্গে শহরের আদব-কায়দা চাল-চলনও গাঁয়ে প্রবেশ করে।

মোট কথা সোনাক্ষেতে কোন ক্ষেতের বালাই নেই, আছে শ তিনশো ঘর গৃহস্থের বাস। তারাই সুখে-দুঃখে আনন্দে-বেদনায় সোনাক্ষেতের আসরকে জমিয়ে রাখে।

সোনাক্ষেতের দত্তদের নামী ঘর। অবস্থা ভালো। এদের পূর্বপুরুষ আগে সোনাক্ষেতেই পানের কারবার করত। একবার এক সন্ন্যাসী আসে তাদের বাড়ীতে। নাগা সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসীর পরামর্শেই দত্তরা পানের কারবার ছেড়ে কবিরাজী শুরু করে। দেখতে দেখতে পসার জমে ওঠে। লোকে বলে সেই সন্ন্যাসীর আশীর্বাদেই নাকি দত্তদের সোনার পয়সা।

সেদিন মঙ্গলবার। সোনাক্ষেতের হাটের দিন। কবিরাজ রাজেন দত্ত ঔষধালয়ে বসেছিল। ঔষধালয়ে লোকজন অনেক। হাটের দিনে সাধারণত ভিড়টা একটু বেশী হয়। তাই রোগীদের ব্যবস্থাপত্তর করতে সেদিন বেলা একটু বেশীই হয়ে যায়। আজও হয়েছিল। সূর্যটা পুব দিক থেকে গড়াতে গড়াতে অনেকটা পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছিল। বাইরে খটখটে রোদ্দুর। পৃথিবীর যেন শ্বাস বইছে। একটা সর্পিল রেখা মাটি থেকে কেঁপে কেঁপে উঠে আবার হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে।

জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তেই রাজেন দত্ত হেঁড়ে গলায় হেঁকে উঠল: 'রসে···এই রসে,···এই হারামজাদা···'

সে চীৎকারে রোগীদের কেউ কেউ যেন হকচকিয়ে উঠল।

একটু পরেই একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে এসে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়াল। হাতে ঘুড়ি-লাটাই। রসে অর্থাৎ শ্রীমান্ রসিকচন্দ্র কবিরাজ রাজেন দত্তর একমাত্র পুত্র। স্থানীয় স্বর্ণময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র।

রাজেন দত্ত চশমার ফাঁক দিয়ে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য ক'রে বলল, 'বলি, এই ভর দুপুরে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?'

রসিকচন্দ্র নিরুত্তর।

'হাবার মতো দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বল না কোথায় চরতে যাওয়া হচ্ছিল।' বলে রাজেন দত্ত সমুখের ক্যাশবাক্সটার উপর জোরে একবার চাপড় মারল।

রসিকচন্দ্র হঠাৎ চমকে উঠল। তার দু' চোখ দিয়ে টসটস ক'রে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। ধরা-ধরা কাঁপা-কাঁপা গলায় এবারে সে বলল, মজুমদারদের চকে যাচ্ছিলাম।'

'হুঁ, মজুমদারদের চকে যাচ্ছিলাম।' বলতে বলতে রাজেন দত্ত একেবারে যেন খেঁকিয়ে উঠল। বলল, 'বলি ঘাড়ে ক'টা মাথা হয়েছে শুনি যে এই ভরা রোদ্দুরে মজুমদারদের চকে চরতে যাওয়া হচ্ছে? পিঠে কি গণ্ডারের ছাল বেঁধেছিস নাকি যে মারের কথা এত সহজেই ভুলে গেলি?'

রসিকচন্দ্র কোন কথা কইল না। মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। রোগীদেরই দু'একজন রাজেন দত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আহা, থাক থাক কবরেজ মশাই, ঢের হয়েছে। পোলাপান মানুষ, একটু ঘুড়ি-টুড়ি উড়াবে বই কি, বয়েসকালে আমরাই কি আর কম কাণ্ড করেছি? ওদের বেলায়ই আর অত রাগ দেখানো কেন?'

'আরে সবটারই একটা মাত্রা আছে বুঝলে না নরহরি? সেই মাত্রার ভেতর থাকলে তো আর কথাটি বলতে হয় না। কিন্তু—সেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই রাগে পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। দ্যাখো না,—দ্যাখো না এই হারামজাদার কাণ্ডটা! পরীক্ষা-টরীক্ষা গেছে—স্কুল যখন বন্ধ—তখন খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম কর, একটু রামায়ণ মহাভারত পড়, তা-না মূর্তিমান এই কাঠফাটা রোদ্দুরে ছুটেছেন ঘুড়ি উড়াতে। এমন ছেলেকে—'

রাগে রাজেন দত্ত যেন কি একটা শক্ত কথা উচ্চারণ করতে গিয়েছিল। কিন্তু পারল না। নরহরি বাধা দিল। বলল, 'আহা, থাক থাক কবরেজ মশাই, অনেক তো হয়েছে। আর কেন? বেশী ভয় দেখাতে গেলে একদিন ভয়টাই ভেঙে যায়। তাতে কোন কাজ হয় না।'

'ভয় ভাঙবে? ভয় ভাঙবে?' রাজেন দত্তর কণ্ঠ একেবারে যেন সপ্তমে চড়ে গেছে: 'আমি···আমি ওর হাড় গুঁড়ো ক'রে ছাড়ব না? ওরে কে আছিস, আজগর—রহমান···'

একজন চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের লোক কাছে এসে দাঁড়াল।

'যা, হারামজাদাকে নিয়ে যা, পশ্চিমের ঘরে সারাদিন শিকল আটকে

রাখবি। কোথাও যেন বেরুতে না পারে!' রাজেন দত্ত বিড়বিড় ক'রে আরও যেন কি বলতে গিয়েছিল। কিন্তু একজন রোগী হঠাৎ খাদ্য-খাওয়া বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করায় সে প্রসঙ্গ আপাতত উহ্য রইল। রাজেন দত্ত আবার রোগী নিয়ে মজল। আজগর আলী শ্রীমান্ রসিকচন্দ্রকে নিয়ে প্রস্থান করল।

রাজেন দত্তের কর্মচারীরা—চাকর গোমস্তারা তাদের মনিবটিকে চিনতে ভুল করে নি। পান থেকে চুনটুকু খসলেও যে রাজেন দত্তের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না, সে কথাটি তারা ভালোভাবেই জানে। আজগর আলীও তাই মনিবের কথামতো শ্রীমান্ রসিকচন্দ্রকে পশ্চিমের ঘরে শেকল আটকে রাখল। দরজাটা টেনে দিতে দিতে বলল, 'এত ক'রে বলি খোকা-বাবু, কর্তার যখন অমন রাগের শরীল তখন একটু হিসেব-টিসেব ক'রে চলো। তা আমাদের কথা যখন শুনবে না, তখন—সারাদিন থাকো পিঞ্জিরার মধ্যে—থাকো ঘর-বন্দী-হয়ে।'

'থাকতে হয় তো থাকব, তাতে তোর কি রে হোঁদল কুতকুত? আহা, কি আমার মায়ার শরীর রে, আমার উপরে এসেছে মাতব্বরি ফলাতে! যা-যা, চাকর-মানুষ চাকুরি কর গে যা।'

'তা তো করবোই। নসিবে যা লেখা আছে তা করতে হবে বই কি? কিন্তু সুখে থাকতে তোমাকে যে অমন ভূতে কিলোয় কেন, সে কথাটাই যে আমরা বুঝতে পারি না।'

'তা তোকে বুঝতে হবে না। ইস্, কোথাকার পণ্ডিত এসে পড়েছে যে সব কথাই তাকে বুঝতে হবে!'

আজগর আলী আর কথা বলল না। হাসতে হাসতে নিজের কাজে চলে গেল।

বন্ধ ঘরে একা পড়ে রইল রসিকচন্দ্র। প্রথমটায় গা'টা তার একটু ছম্-ছম ক'রে উঠল। ভাণ্ডাই বিলের ভূতের কথা সে শুনেছে। ছেলেপিলেদের একা পেলে সে ভূত নাকি তাদের নাভিতে চুমুক দিয়ে শরীরের সবটুকু রক্ত শুষে খায়। সে ভূত রসিকচন্দ্রের নাভিতে এসেও চুমুক দেবে না তো? দক্ষিণের ঐ জানালার কাছেই ঐ যে নিমগাছটা, ঐ নিমগাছের মগডাল

থেকেই সে যদি লাফিয়ে পড়ে? পুঁটিপিসির কাছে তো সে শুনেছে যে তেনাদের অসাধ্যি কিছু নেই। যখন যেমন খুশি তেনারা তেমন দেহ ধারণ করতে পারে। এখন ঐ নিমগাছ থেকে সে যদি ঘরে লাফিয়ে পড়তে চায়, তা হ'লে আর তাকে বাধা দেবে কে? সে যে রসিকচন্দ্রের নাভিতে তার ছুঁচলো মুখটা লাগিয়ে চুকচুক ক'রে সবটুকু রক্ত টেনে নেবে!

ভাবতে গিয়ে রসিকচন্দ্রের রক্ত একেবারে যেন হিম হয়ে এল। বুকটা কেমন যেন দুরদুর ক'রে উঠল। একবার জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠবে নাকি! একবার কেঁদে ফেটে পড়লে আজগর আলী কি দরজাটা খুলে না দিয়ে পারবে! না, গালমন্দ যা-ই করুক, আসলে বেচারা লোক ভালো। আজ গ···

আজগর আলীকে ডাকতে গিয়েও হঠাৎ আবার থেমে গেল রসিকচন্দ্র। মনটায় তার কেমন যেন খটকা লাগল। ছিঃ ছিঃ, সে কি এতই ভীরু যে দিন দুপুরে ঘরে থেকেও ভূতের ভয়ে কেঁপে মরবে? এ কথা যদি রাধা, নেরু ওরা শোনে তা হ'লে যে সে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। না, সে কিছুতেই চেঁচাবে না। মা শ্মশান-কালীর দিব্যি, সে চেঁচানোর কথা একবার মনেও আনবে না। যদি মনে আনে তা হ'লে মা শ্মশান-কালী যেন তাঁর নাগিনী-যোগিনী দুটোকে পাঠিয়ে রসিকচন্দ্রের ঘাড় মটকে দিয়ে যান। মা শ্মশান-কালী, যে-সে দেবতা নয়—একেবারে জাগ্রত দেবতা। পুঁটিপিসি বলে, কাঁচাখেকো দেবতা। তাঁর কাছে কোন ছল-চাতুরী জারিজুরি খাটবে না—হ্যাঁ।

রসিকচন্দ্র মা শ্মশান-কালীর উদ্দেশে প্রণাম জানাল। তার পর তক্তপোষের উপর একটি চেয়ার পেতে গিয়ে উঠে বসল পশ্চিমের জানালাটার উপর। ব্যস্, আর ভয় কি! ঐ না পথ-ঘাট, বাড়ী-ঘর সব দেখা যাচ্ছে—ঐ না সরকার বাড়ীর মণ্ডপের চালে দুপুরের রোদ পড়ে চিকমিক করছে। এই দিন দুপুরে ঘরে ঢোকে ভূতের বাপের তেমন সাধ্যি নেই। রসিকচন্দ্র এবারে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো।

পশ্চিমের জানালা থেকে অনেক দূর দেখা যায়। সোনাক্ষেতের যে রাস্তাটি সরকার বাড়ীর মণ্ডপের কাছ দিয়ে দেওয়ানজী বাড়ীর ঢেঁকিশালের পাশ দিয়ে পচু সা'র বাগানে গিয়ে পড়েছে সেটি তো এখান থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে।

রসিকচন্দ্র সে দিকেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

পচু সা'র রাখাল কাঙালীচরণ একপাল গরু নিয়ে গাঙে গেল। প্রেমানন্দ এক ঝাঁকা কলা মাথায় নিয়ে হাট থেকে বাড়ী ফিরল। ফেলু সাহার শেষ পক্ষের বৌ সোহাগিনী পান-দোক্তার কৌটোটি হাতে নিয়ে পণ্ডিত বাড়ীতে এল দুপুরের মজলিস জমাতে।

পশ্চিমের জানালায় বসে রসিকচন্দ্র সব কিছুই লক্ষ্য করল। দুর্গাখুড়োদের চিলেকোঠার মাথায় বসে তিনটে কবুতর, দুটো চড়াই তাদের লেজ ছড়িয়ে নেচে গেল তা-ও তার দৃষ্টি এড়াল না। এবারে সত্যি আবার মন খারাপ হয়ে গেল রসিকচন্দ্রের। ঐ চড়াই-কবুতর ওদেরও একটা জীবন আছে। ওরাও খুশিমতো খেলতে পারে, নাচতে পারে। রসিকচন্দ্রের সে স্বাধীনতা-টুকুও নেই।

ধিক্—তার জীবনে ধিক্—এ পরাধীনতার চেয়ে মৃত্যু ভালো। মা শ্মশান-কালী যদি দয়া ক'রে তাকে ডেকে নিতেন, তাতে আর যা হোক না হোক, বাবাকে আচ্ছা জব্দ করা যেত। মা শ্মশান-কালীর সেটুকু দয়া হবে কি? একটা ক্ষুব্ধ অভিমানে রসিকচন্দ্রের দুটি চোখের পাতা টলটল ক'রে উঠল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। একটু পরেই সে জল গেল শুকিয়ে। সেখানে ঝকমক ক'রে উঠল খুশীর বিদ্যুৎ।

সরকার বাড়ীর মণ্ডপের কাছ দিয়ে পা টিপে টিপে গোলাপ আসছে।

গোলাপ আসছে। প্রতিবেশী গোপাল চক্রবর্তীর মেয়ে গোলাপ। সোনা মাজা গায়ের রঙ। ছবির মতো চেহারা। ঝাঁকড়া চুল পিঠে নাচিয়ে গোলাপ সারা পাড়া ঘুরে বেড়ায়।

বুড়ীরা গালে হাত দিয়ে বলে, আঃ—বাউনখুড়োর মেয়ে বটে একখানা! একেবারে যেন টাট্টু ঘোড়া।

গোলাপ তাদের গা ঘেঁষে বসে। কোলে গড়িয়ে পড়ে। আর ফিকফিক ক'রে হাসে।

'আঃ ম'লো, বুড়ী মাগীর কাণ্ডখানা দেখোনা গো, যেন কচি খুকী আর কি? কোলে ঢলে পড়ছে! অলো, অত ঢলাঢলি করবি তো তবে নাগরের সন্ধান কর না। বয়েসটা তো আর নেহাত কম হলো না। এগারো পেরিয়ে তো বারোয় গিয়ে পড়ল। তোদের মতো বয়েসে আমরা যে দু'বার

পরের ঘর ক'রে এসেছি।' বলে হলধরের মা নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল।

একটা লজ্জার ছায়া যেন ঘনিয়ে এল গোলাপের মুখমণ্ডলে। তার গাল দুটো রক্ত গোলাপের মতো লাল হয়ে উঠল। দুটি টানা টানা কালো চোখে যেন কিসের গভীর স্বপ্ন!

নিজের কচি মুখটা হলধরের মার মুখের সামনে এনে, তার চোখে চোখ রেখে গোলাপ বলে, 'তবে তারই একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও না ঠাকুমা।'

'আমরা তা দিতে যাবো ক্যানে লো, তোর খ্যামতাটা কি আর কম! দিনে দিনে যে রূপের জাল ছড়াচ্ছিস তাতে কত পাখি আপনি এসে ধরা দেবে!'

বলে হলধরের মা একটু মুচকি হাসি হাসল। গোলাপের ঠোঁটেও হাসি ছড়ানো। দুটি গালে হাসি জড়ানো। হাসতে হাসতে হলধরের মার কোল থেকে উঠে পড়ল সে। তারপর তার পিঠে ছোট্ট একটি কিল চাপিয়ে দিয়ে সে পালিয়ে গেল।

হলধরের মা এবারে তাঁর দুটি দাঁতহীন মাড়ি বাজিয়ে হেসে উঠল।

গোলাপ, সেই দুষ্টু গোলাপ আসছে।

রসিকচন্দ্র চাপা গলায় ডাকল, 'গোলাপ! এই গোলাপ!'

গোলাপ থমকে দাঁড়াল। এদিক চাইল। সেদিক চাইল।

কিন্তু কে ডাকছে, কোথেকে ডাকছে তা কিছুতেই ঠাহর ক'রে উঠতে পারল না।

'গোলাপ! এই গোলাপ! এই যে···হ্যাঁ, হ্যাঁ···এই যে—এদিকে।'

গোলাপ এবারে দেখল রসিকচন্দ্রকে। পশ্চিমের জানালায় কুঁজোমুজো হয়ে বসে আছে রসিকচন্দ্র। মুখটা শুকিয়ে যেন কালো হয়ে গেছে। উস্ক-খুস্ক চুলগুলো এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়েছে।

গোলাপ বলল, 'এই তোমার ঘুড়ি ওড়ানো রসিকদা, আমি মজুমদারদের চকে—'

দুই ঠোঁটের মাঝখানে আঙুল চেপে ধরে গোলাপকে চুপ করতে বলল রসিকচন্দ্র। গোলাপ চুপ করল। তারপর চুপি চুপি তার কাছে গিয়ে বলল, 'কি? ব্যাপার কি গো রসিকদা?

'ভীষণ ব্যাপার, আগে শিকলটা খোল, সব কথা খুলে বলছি।'

গোলাপ শিকল খুলতে গেল। কিন্তু দরজার শিকলটি অনেকটা উঁচুতে। অতদূরে গোলাপের হাত গেল না। বিমর্ষ মুখে সে বলল, 'পারছি নে যে—উঃ, কত উঁচুতে?'

'যাঃ, বোকা মেয়ে, মাথাটা তোর শুধু দেখতেই বড়, আসলে ওর ভেতর কিছু নেই।'

'হাত যে কিছুতেই যায় না, তাতে আমার মাথার কি দোষ হলো?'

'সে জন্যেই তো বলছিলাম মাথাটা তোর একেবারে ফাঁকা। কেন, আমতলায় ইট নেই? নিয়ে আয় না তার ক'খানি। ইটের 'পরে ইট চাপিয়ে—'

'ওঃ, সেই কথা! তা এতক্ষণ বলো নি কেন? আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।'

বলে গোলাপ ইটের সন্ধানে চলে গেল।

শিকল খুলে দু'জনে যখন রাস্তায় এল তখন বেলা অনেকটা পড়ে এসেছে। রোদ অনেকটা মরে এসেছে। অপরাহ্নের একটা হিমেল হাওয়া বইছে শিরশির ক'রে। হাটুরেদের কেউ কেউ ঘরে ফিরছে।

চলতে চলতে রসিকচন্দ্র বলল, 'আয়, একটু পা চালিয়ে আয় গোলাপ, ঐ যে শালা পক্ষীরাজ বাতাসে পাখা বাজিয়ে ফাঃ ফাঃ করছে, আমি একটানে ওকে সাবাড় করতে না পারি তো আমার নাম—'

রসিকচন্দ্র কথা শেষ করল না। দ্রুত পা চালিয়ে সে মজুমদার-চকের দিকে ছুটল।

তিন

মাখন সাহার 'দেইল' নেমেছে। প্রতি বছরই 'দেইল' নামে। কাল বোশেখির 'দেইল'। ভাগলপুরের পাটনি বাড়ী থেকে শিবঠাকুরকে মাথায় ক'রে নিয়ে আসে প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ সাধু।

শিবঠাকুরের নাম কালাচান্দ। কাঠের শিব। অনেকটা একখানি ভারী তক্তার মতো। তার গলা পর্যন্ত লাল সালুতে মোড়া। মাথায় একটা সিঁদুরের টিপি। সেই টিপির উপর দুটি সোনার চোখ। কবে তৈরি হয়েছিল কালাচান্দ কেউ জানে না। অনেকে বলে কালাচান্দ মোটেই তৈরি হয় নি। উত্তরে সেই যে হিমালয় পর্বত—সেই পর্বত থেকে নদীতে ভেসে এসেছিল সে। ছিদাম পাটনি ধলেশ্বরীতে নাও বাইত। কালা-চান্দকে দেখে সে-ই ঘরে তুলে এনেছিল। তখন থেকেই কালাচান্দ পাটনি বাড়ীতে আছে।

মাখন সাহা প্রতি বছর কালাচান্দকে নিয়ে আসে। সরকার বাড়ীর মণ্ডপে রেখে পুজো দেয়। পনেরো-কুড়ি দিন ধরে একটানা চলে এই পুজো। এ পাড়ার সে-পাড়ার অনেকে এসে তাতে সন্ন্যাসী হয়। খাটনা খাটে। প্রসাদ পায়। দিন কাটে এইভাবে। রাতে সন্ধ্যারতির পরেই শুরু হয় 'কাছ'। কালীনৃত্য! শুধু কালী নয়। কানাই বলাই-এর নৃত্য থেকে শুরু ক'রে মোখা 'কাছ' বা কালীর মুখোশ নৃত্যে তা শেষ হয়! তারপর বেদে-বেদেনীর গান! বিচিত্র সঙ! মরণ সূত্রধরের আহ্লাদচান্দের সঙ সবার মন কেড়ে নেয়!

প্রতি বছরের মতো এ বছরও 'কাছ' নেমেছিল!

রসিকচন্দ্র গোপাল চক্রবর্তীর উঠোনে গিয়ে ডাকল, 'গোলাপ, এই গোলাপ!'

রাত হয়েছিল! তবে খুব বেশী নয়! মাত্র একটু আগেই গোলাপ তুলসীতলায় সন্ধ্যা পিদিমটি দিয়ে এসেছে! মজুমদারের চক থেকে ছেলেরা ঘুড়ি উড়িয়ে ফিরেছে! গোলাপ ভেতরের বারান্দায় বসে গুনগুন ক'রে গান গাইছিল! বিয়ের গান! সদি পিসী আর প্রেমানন্দের বৌ রায়বাড়ীর

বিয়েতে গেয়েছিল! গোলাপ সেইখানেই শুনেছে! বড় ভালো লেগেছে তার গানখানি! কিন্তু আজও সে তা রপ্ত করতে পারে নি। তাই সময় সুযোগ পেলেই গোলাপ সেই গানের রেশ টানে : 'জলের ঘাটে বাঁশি বাজে লো কমলা, আমরা জলে যাই।'

'গোলাপ!—এই গোলাপ!—'

গান থামল গোলাপের। কান পাতল সে বাইরে।

'গোলাপ! গোলাপ শুনছিস্?'

রসিকচন্দ্রের কণ্ঠে একটা ব্যস্ততার সুর।

এবার উঠল গোলাপ। তার দুই কপোলে হাসির রঙ লাগল।

দৌড়ে এল বাইরে। বলল, 'ও মা, রসিকদা? তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসো না। মা তো সেই রান্না ঘরে আছেন।'

'ঠাকুর্দা কোথায় রে?' রসিকচন্দ্র গোলাপের বাবা গোপাল চক্রবর্তীকে ঠাকুর্দা বলে ডাকে।

শুনে গোলাপ হাসল আবার। সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি দুষ্টু চোখও হেসে উঠল। বলল, 'কেন? বাবাকে তোমার খুব ভয় ক'রে বুঝি?'

'না, তবে—' রসিকচন্দ্রকে কথা শেষ করতে হলো না। গোলাপই কথা নিল কেড়ে।

বলল, 'ওঃ, বুঝেছি।'

তার দুষ্টু দুটি চোখ আবার হেসে উঠেছে।

'তা তোমার ভয় নেই। বাবা বড় আখড়ায় কেত্তনে গেছেন। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হবে।'

'তা হলে তো বেশ হয়েছে। চল্ তবে বেরিয়ে পড়ি।'

'এত রাত্তিরে? এত রাত্তিরে আবার কোথায় যাবে গো? সদি পিসীর শশা গাছটি মুড়োতে বুঝি?'

'আরে ধ্যেৎ!' রসিকচন্দ্র মুখে একটা অদ্ভুত রকমের শব্দ করল।

তারপর আবার বলল, 'কাছ দেখবিনে, কাছ? কাল বৈশাখীর কাছ। এবারে কলাকোপা থেকে যা সঙ এনেছে না—হাসিয়ে হাসিয়ে পেটে নাকি একেবারে খিল ধরিয়ে দেবে?'

'তাই নাকি?'

'ঐ যা, তুই এখনও শুনিস্ নি বুঝি? সিঙ্গাইরের মোখা কাছ দুর্লভ শীল

ঐ যে যার গড়ানো গড়ানো চুল আর জড়ানো জড়ানো দাড়ি—সেই দুর্লভ শীল যা একখানি মোখা বানিয়েছে না, দেখলে চোখ দুটি ঠিকরে যায়।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ রে। এই তো আমি নিজ চক্ষে দেখে এলাম। আরও কত ছেলেমেয়ে ভিড় করেছে সে মোখা দেখতে।

'খুব সুন্দর, নয় ?'

'সুন্দর বলতে সুন্দর, এক্কেবারে সুন্দরের টেক্কা। এবারে মিরকাদিম যাবে কিনা 'কাছ' নাচতে, মাখন সাহা দলের জন্যে তাই ভালো ভালো পোষাক বানিয়েছে।'

'তাই নাকি ? সে কথাটা তো আমায় আগে বলো নি রসিকদা !'

'আমিও কি আর আগে জেনেছিলাম ছাই ? জানলাম তো আজকে। ঐ যে শ্যামপুরের মোহন বেদে—আরে ঐ যে, যে গোঁফ পাকিয়ে চোখে নীল চশমা পরে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচে, সে-ই তো বলল আজকে কথাটা। আমার কাছে একটা পান চেয়েছিল। সেই পান মুখে পুরতে পুরতে মোহন বেদে বলল, 'রসিক, খবর-টবর কিছু রাখো নি হে ?'

'কি খবর গো মোহনদা !'

'আরে এবারে যে ষোড়শোপচার হে, মাখনবাবুর 'কাছ' যে এবার সব ব্যাটাকে পাছ করেছে—সবার উপরে টেক্কা দিয়েছে। দল এবার মিরকাদিম যাচ্ছে।'

সেই মোহন বেদেই তো আমায় সাজঘরে নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাল। আর বললে তোর পেত্যয় হবে না গোলাপ, পোষাকে-পোষাকে সাজঘর এক্কেবারে ঠাসা। দেয়ালে দড়ি টানিয়ে পোষাকগুলো সব ঝুলিয়ে রেখেছে। তার উপর 'হেজাগ লাইটের' আলো পড়েছে।—পোষাকগুলোও জ্বলছে ঝিলমিল করে। মহাদেব বাবার ত্রিশূলখানা—যা এনেছে না, এই ইয়া লম্বা—' বলে যতদূর হাত যায় রসিকচন্দ্র হাত দুটিকে ততদূর ছড়িয়ে দিয়ে ত্রিশূলের সাইজটি গোলাপকে দেখিয়ে দিল।

গোলাপ চোখ দুটিকে বিস্ফারিত ক'রে বলল, 'বাব্বাঃ, এত বড় ত্রিশূলও হয় ?'

'হয় কি না হয়, চ' না একবার তুই নিজ চোখে দেখে আসবি।' বলে রসিকচন্দ্র গোলাপের একখানা হাত ধরে—হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে চলল।

গোলাপ বলল, 'উঃ, লাগে, লাগে। হাতটা ছাড়ো না। একবার মাকে বলে আসি।'

'না, না। ঠাকুরমাকে কিছুই বলতে হবে না। সকল ছেলেমেয়েই আজ সরকার বাড়ীর মণ্ডপে যাচ্ছে। ঠাকুরমাকে আবার বলতে হবে কি রে? এতটা ডাগর হলি তবুও তোর বুদ্ধিসুদ্ধি—কিছুই হলো না।'

অগত্যা গোলাপকে যেতে হলো।

এটা প্রথা। প্রতি বছর কালাচান্দের সমুখে প্রথম 'কাছ' নাচবে। কালাচান্দের আশীর্বাদ নিয়েই 'কাছে'র দল টহলে বেরুবে। এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাবে।

এ বছরও তার আয়োজন হয়েছিল।

সরকার বাড়ীর মাঠটা ইতিমধ্যেই ভরে উঠেছে। লোকে লোকে গিজ-গিজ। শুধু সোনাক্ষেত নয়। আশেপাশের আরও দু'দশখানি গ্রামের লোক যেন ভেঙে পড়েছে। মাখন সাহার 'কাছ' আজ প্রথম নামবে; কত রং তামাসা হবে, তা না দেখে কি আর চুপ ক'রে ঘরে বসে থাকা যায়? তাই সাত তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে হাটুরেরা ফিরেছে হাট থেকে। যশোদাবাবুর বৈঠকখানায় আজ তাসের আড্ডা বসে নি। এমন কি বড় আখড়ার কীর্তনের আসরও জমে নি। সব হাট সব পাট ভেঙে লোক এসে ভিড় করেছে সরকার বাড়ীর মাঠে। রসিকচন্দ্রও গোলাপকে নিয়ে একটা সজনে গাছের নীচে এসে দাঁড়াল। এদিক ওদিক চাইল। না, লোক হয়েছে বটে। সাহাদের মাঠে যাত্রার আসরেও বুঝি এত লোক হয় না। একেবারে লোকে লোকারণ্য।

'গোলাপ, এই গোলাপ!'

গোলাপ আনমনে অন্যদিকে তাকিয়েছিল। রসিকচন্দ্র তার পিঠে একটা ধাক্কা মেরে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'গোলাপ!'

'কি রসিকদা!'

'দেখছিস!'

'কি?'

'ঐ যে রে—ঐ যে আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে।'

'ঐ তোমার মহাদেব বাবা বুঝি?'

'হ্যাঁ। দেখছিস নে কেমন লম্বা লম্বা জটা, পরনে বাঘছাল, হাতে ত্রিশূল।'

'বাব্বা, মহাদেবের যা রূপ না, দেখলেই মাথাটা ভিরমি দিয়ে ওঠে। যেন আস্ত একখানা গাছের গুঁড়ি।'

'যাঃ, ও কথা বলতে নেই। ও তো আর যে সে নয়, মহাদেব বাবা। তা মহাদেব বাবা একটু মোটাসোটা হবে বই কি! যাবি! যাবি গোলাপ ওঁর কাছে? মহাদেব বাবা একটিবার যদি ত্রিশূলখানি দেয় তো তা নেড়ে-চেড়ে দেখে আসবি?'

'না বাবা, আমার ওতে কাজ নেই। তোমার গরজ পড়ে থাকে তো—একবার গিয়ে চেয়েই দেখো না।'

'তুই যাবি নি?'

'না। আমার মন লয় না।'

'তা হলে আর আমিও যাবো না।' রসিকচন্দ্রের কণ্ঠটা যেন একটু গম্ভীর শোনাল।

গোলাপ বলল, 'কেন? রাগ হলো বুঝি?'

'না, রাগ হবে কেন, এর মধ্যে আর রাগ করবার কি আছে?'

'বুঝেছি গো গোসাঁই, বুঝেছি, এ্যাদ্দিন তোমার সঙ্গ করলাম আর এ কথাটুকু বুঝতে পারব না? নাও চলো। রাগ ক'রে আর কি হবে? তাতে আজকে 'কাছ' দেখাটাই পণ্ড হবে। তাতে আমারও লাভ নেই। তোমারও লাভ নেই।

রসিকচন্দ্র এবারে হিহি ক'রে হেসে উঠল।

যে লোকটি মহাদেব সেজেছিল তার নাম সতীশ পাটারি। সোনাক্ষেতের ইন্দ্রপাটারির ছেলে। উচা-লম্বা—বেশ মোটাসোটা চেহারা। তার ভুঁড়িটি ঠিক ধামার মতো, বুকের কাছ থেকে ক্রমশ উঁচু হয়ে তলপেটে গিয়ে নীচু হয়েছে। চলতে গেলেই সে ভুঁড়িটি থলথল ক'রে নড়ে ওঠে।

রসিকচন্দ্র তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একবার তার মুখের দিকে চাইল। ভুঁড়ির দিকে তাকাল। না, মহাদেব বাবার যেন দিশা নেই। বস্তা বস্তা সিদ্ধি টেনে—মহাদেব বাবা একেবারে যেন বুঁদ হয়ে আছে। চোখ দুটি হয়েছে টুকটুকে লাল। সে দিকে তাকাতেই ভয় করে।

রসিকচন্দ্র হাল ছাড়ল না। হাল ছাড়বার পাত্রটিই সে নয়। সে নানা কায়দা ক'রে মহাদেব বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল। একবার সে শিয়াল ডেকে উঠল। একবার কুকুর। একবার সে মুখ দিয়ে করল শিয়াল কুকুরের দৌড়োদৌড়ির শব্দ।

'খোকা!'

কথা কয়েছে, মহাদেব বাবা কথা কয়েছে। তার আলতা মাখানো দুটি ঠোঁট নেড়ে মহাদেব বাবা তাকে খোকা বলে ডেকেছে।

রসিকচন্দ্রের দুটি চোখে যেন বিশ্ববিজয়ের আনন্দ।

'খোকা!'

'আমায় কিছু বলচো মহাদেব বাবা?'

'এখানে দাঁড়িয়ে কেন? 'কাছ' দেখবে না?'

'তা দেখবো বই কি? নইলে আর এত রাত্রিরে মণ্ডপে এনু কেন?'

'কাছ দেখবে তো যাও না, এখনই যে 'কাছ' আরম্ভ হবে। ভিড যা হয়েছে, তাতে এখন ভেতরে ঢুকতে পারলে হয়।' বলে মহাদেব বাবা দেশলাই জ্বালিয়ে একটা বিড়ি ধরাল। একটি কড়া টান মেরে এক মুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে দিল বাতাসে। সে ধোঁয়া গড়িয়ে গড়িয়ে শূন্যে মিলে গেল।

গোলাপ রসিকচন্দ্রের কানে কানে বলল, 'এ তোমার ক্যামুন মহাদেব বাবা গো রসিকদা, এ যে দেখছি বিড়ি টানছে।'

'তাতে হয়েছে কি? সখ ক'রে না হয় মহাদেব বাবাই সেজেছে, তাই বলে বিড়ি খাওয়াটাও ছেড়ে দেবে নাকি?'

'ও মা, সে কি কথা গো, মহাদেব বাবা আবার বিড়ি খায় নাকি?'

'খায়, খুব খায়। যে বস্তা-বস্তা সিদ্ধি উড়াতে পারে, গাদা গাদা গাঁজা টানতে পারে, সে সামান্য ঐ বিড়িটুক খাবে না?

'ও তাই নাকি'—বলে গোলাপ চুপ ক'রে গেল।

এবারে গলায় দেড়শো মেডেল ঝুলানো ঢাকি হরেকেষ্টর ঢাকে কাঠি পড়ল। ঢ্যাকুনা নাকুড়—ফ্যাকুনা নাকুড়···নাকুড়···নাকুড়···ঢ্যাং।

মহাদেব বাবা বলল, 'খোকা, 'কাছ' যে আরম্ভ হয়ে গেল হে।'

'তা যাক্ গে!'

'কেন, ঐ যে বললে 'কাছ' দেখতে এয়েছ, তা 'কাছ' দেখবে না?'

'তা দেখবো।'

'তবে আর দাঁড়িয়ে কেন, এগিয়ে যাও। ঐ দেখো আসরে কানাই-বলাই এসে গেছে।'

'মহাদেব বাবা।'

'কিছু বলরে?'

'তোমার ঐ ত্রিশূলটা একটু দেবে মহাদেব বাবা?'

'কেন?'

'তেমন কিছু নয়। এমনিই। এই গোলাপ—গোলাপ আর কোন দিন এমনি ত্রিশূল দেখে নি কি না—তাই একটু নেড়ে-চেড়ে দেখবে।'

গোলাপ কাছেই দাঁড়িয়েছিল। রসিকচন্দ্রের কথায় একবার আড় চোখে তাকাল মহাদেব বাবার দিকে। একটু মুচকি হেসে বলল, না, না, মহাদেব বাবা, রসিকদা মিছে কথা বলছে। ওর যেন আর গরজ নেই? ও-ই তো আমায় টেনে-টুনে ত্রিশূল দেখাতে নিয়ে এল।

'হেই, আমি নিয়ে এয়েছি—না তুই নিজে—'

'না, না, কক্ষনো না। তুমিই তো আমায় বললে—'

'যা বলেছি তো বেশ করেছি। আমি তো আর কারো মাথার দিব্যি দিই নি যে আমি বলেছি বলেই আমার পিছু পিছু ছুটে আসতে হবে।'

দু'জনের কথা কাটাকাটিতে বেশ মজা উপভোগ করল মহাদেব বাবা। হয়তো তারও ছোটবেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। মনটাও তার ভিজে এল অমনি। রসিকচন্দ্রের হাতে ত্রিশূলটি দিতে দিতে সে বলল, তা দেখবে, দেখো, যত মন চায় দেখো। শিবের ত্রিশূল তো আর তাতে ক্ষয়ে যাবে না।'

বলতে বলতে একটু হাসল মহাদেব বাবা।

গোলাপ বলল, 'আমিও দেখবো মহাদেব বাবা!'

'ইস্…তুই দেখবি কিরে! এই না একটু আগেই তুই বললি ত্রিশূল দেখার তোর মোটেই গরজ নেই। যত গরজ সবই এই রসিকচন্দ্রের!'

'ও আমি কিছু মনে ক'রে বলেছি বুঝি? ও তো আমি মিছিমিছি বলেছি।'

'ওঃ, ওর নাম মিছিমিছি বলা? চোখ-মুখ কালো ক'রে যেভাবে তুই বললি যে তা শুনে আমার মাথাটা যেন আগুন হয়ে গেল।

'তা আগুন হলে আর আমি করবো কি? আমি তো—

'ইস্, এখন আবার ভালো মানুষ সাজা হচ্ছে। আচ্ছা বিচারটা মহাদেব বাবাই করুক। আমি ঠিক ঠিক বলেছি না মিথ্যে ক'রে বলেছি সে বিচারটা মহাদেব বাবাই করুক!' দুজনের কথা শুনে আবার হাসল মহাদেব বাবা। তার পিঠ ছড়ানো লাল লাল জটাগুলো যেন নড়ে উঠল। কাজলটানা দুটো বড় বড় চোখও যেন হেসে উঠল। তারপর রসিকচন্দ্রের হাত থেকে ত্রিশূলটি গোলাপের হাতে তুলে দিল। তুলে দিয়েই একেবারে হোহোঃ ক'রে হেসে উঠল। তার ধামার মতো ভুঁড়িটিও যেন তালে তালে দুলে উঠল।

হাসল রসিকচন্দ্রও। গোলাপের চোখে চোখ রেখে হাসল। মহাদেব বাবার বিচার দেখে হাসল। একটুও তার রাগ হয় নি। বরং সে খুশী হয়েছে। মহাদেব বাবা বুঝি অন্তর্যামী, নিশ্চয়ই সে রসিকচন্দ্রের অন্তরের কথা জানে। সেই অন্তরের কথা জেনেই ত্রিশূলটি সে গোলাপের হাতে তুলে দিয়েছে।

রসিকচন্দ্র তাতে রাগ করবে কেন?

বাড়ী ফিরতে রাত হলো। বোধ হয় বারোটা। যশোদাবাবুর বাড়ীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারোটার ঘণ্টা বাজল।

গোলাপ আর রসিকচন্দ্র সোজা পথে বাড়ী ফিরল না। ফিরল— স্বর্ণ কামারণীর বাড়ীর কাছের চিপা গলিটি দিয়ে। লোকে বলতো গলিটি খারাপ। যশোদাবাবুর বাড়ীর কে যেন ফাঁসী দিয়ে মরেছিল। না, না ফাঁসী নয়, তাকে মেরে বাগানের আমগাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। যশোদা-বাবুর বাড়ীরই এক তরফ করেছিল এ কাজ। সে অনেক কথা। অনেক কাহিনী। তারপর থেকেই ছেলেটিকে নাকি দেখা যেতো স্বর্ণ কামারণীর চিপা গলিতে। রাতের অন্ধকার যখন গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে ঘন হ'য়ে উঠত, ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে নিশাচর পোকারা যখন নিশীথ রাতের শিঙা ফুঁকতো, তখন—সেই তখন নাকি—উত্তরের গাব গাছটা থেকে স্বর্ণ কামারণীর চালে ঝুপ ক'রে লাফিয়ে পড়তো ছেলেটি। আঁটসাঁট কাপড় পরনে, স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে। স্বর্ণ কামারণীর চালে দাঁড়িয়ে সে নাকি মোটা মোটা দুটি মুগুর ভাঁজত। অবিশ্যি স্বর্ণ কামারণী এ সব খবর কিছুই রাখে না। সে বলে, দুঃখী মানুষ, সারা দিন খেটেখুটে বিছানায় পড়লে সারা রাত

আর হুঁশ থাকে না। তখন কোন্ সতীনের পুত এসে আমার চালে নাচে—না কার গাছে ঝোলে সে খবর আমি রাখবো কি ক'রে ?'

স্বর্ণ না রাখলেও মতির মা সে খবর রাখে। পাশাপাশিই বাড়ী। না, ঠিক পাশাপাশি নয়। স্বর্ণ কামারণীর বাড়ির পর রাধারমণ কর্মকারের বাড়ী। তারপরেই মতির মা'র দোতলা টিনের ঘর। সেই টিনের ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়েই নাকি মতির মা দেখেছে ছেলেটিকে। একদিন দু'দিন নয়, পর পর কয়েক দিন। সে-ই সে কাহিনীকে পল্লবিত ক'রে গ্রামময় রটনা করেছে।

রসিকচন্দ্রও শুনেছে সে কাহিনী। শুনে সে বিশ্বাসই করে নি। বলেছে, আরে ছোঃ ছোঃ, মতির মা মিছে কথা বলেছে। একেবারে মিছে কথা। নইলে কত দিন ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে আমি নিজে গেছি ও গলি দিয়ে। গেছি সতীশ চক্কোত্তির গন্ধরাজ ফুল আনতে। আমার চোখে কিছু পড়ল না—ভূত দেখল কি না মতির মা। মতির মা নিজেই ভূত আর কি!

বলে হিহি ক'রে হেসেছে রসিকচন্দ্র।

সতীশ চক্কোত্তির গন্ধরাজ ফুলের লোভেই আজও এ পথ দিয়ে চলেছিল রসিকচন্দ্র। এইতো সময়। চক্কোত্তি মশায় বুড়ো মানুষ। নিশ্চয়ই এখন জেগে নেই। এই সুযোগে গন্ধরাজগুলো ফাঁক করতে পারলে কাল সকালে সে তো ফুলের রাজা। আর কে পায় তাকে!

কাল সকালে তুলসী মণ্ডপের বারাণ্ডায় ফুলের হাট মিলিয়ে বসবে রসিকচন্দ্র। ফুলের রাজা। হিংসুটে রাধাবল্লভটার ইচ্ছে হয় তো থাকতে পারে সঙ্গে। তবে তার সহকারী হয়ে। রাজা হবার সুযোগটি তো সে কোন মতেই হাতছাড়া করতে পারে না।

গোলাপ বলল, 'রাত যে অনেক হলো রসিকদা!'

'কোথায় রে, এই তো সবে বারোটা। দেখলি নে যশোদাবাবুর বাড়ীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারোটা বাজল!'

'সে বাজুক গে। বারোটাই কি আর কম রাত!'

'সে কি রে! বারোটা আবার রাত হলো কি? সরকার বাড়ীর মণ্ডপের ভিড় তো এখনও ভাঙে নি। হাটুরেরা তো এখনও হাট থেকে ফেরে নি।

'সে না ফিরুক গে, আমায় তুমি বাড়ী দিয়ে এসো। আমার বড় ভয় করছে।'

‘ভয়? ভয় আবার কিসের? ভূতের ভয় বুঝি? আরে ছোঃ ছোঃ ও সবই মিথ্যে কথা। আসলে ভূত-টুত কিছু নেই। আমি কত রাতে গেছি এ গলি দিয়ে। ভূতের লোভ জাগানোর জন্য গরম গরম মটর ভাজা চিবুতে চিবুতে গেছি। কিন্তু তোর গা ছুঁয়ে বলছি গোলাপ, ভূত তো দূরের কথা—ভূতের ছায়াটি পর্যন্ত কোনদিন আমার চোখে পড়ে নি।’

‘না গো না, ভূতের ভয় নয়। ভূতের ভয় নয়। ভয়টা হলো বাবার। বাবা বোধ করি এতক্ষণে কেত্তন থেকে ফিরেছেন।’

‘ফিরেছেন নাকি? দূর বোকা মেয়ে। কেত্তন কি এত সকালে ভাঙে না কি? সে তো ভাঙে একটা-দুটোয়। তুই একটু দাঁড়া আমি চট ক’রে ফুলগুলো তুলে আনছি।’ বলে রসিকচন্দ্র সতীশ চক্কোত্তির ফুল বাগানে ঢুকে গেল। যখন ফিরে এল, তখন তার কোঁচড় ফুলে ফুলে ভরে গেছে।

চার

দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বছর গড়ায়। পাতা ঝরানো শীত—আগুন জলা গ্রীষ্ম—কান্নাভেজা বর্ষা আর নতুন ধানের গন্ধ মাখা শরতের রথ সোনা ক্ষেতের উপর দিয়ে চলে যায়। সোনাক্ষেতের কত পরিবর্তন! সোনাক্ষেত ইউনিয়ন বোর্ডের নতুন প্রেসিডেণ্ট হয়েছে রাখালবাবু। রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী। লোকে নেপথ্যে ঠাট্টা করে বলে, মাকালচন্দ্র। মানে চেহারাটা ঝকঝকে হলে কি হবে ভেতর যে একেবারে লবডঙ্কা। ফাঁকা। আরে ভেতরে যদি কিছু থাকবেই তাহলে কি সারাদিন আর ঘ্যানর ঘ্যানর করে বাজতে পারে? কথায় বলে না শূন্য ভাণ্ড বাজে বেশি। আমাদের মাকাল চন্দ্রেরও হয়েছে তাই।

অবশ্যি কথাটা একটু বেশীই বলে রাখালবাবু। নিজের গৌরবের কথা। বংশ মর্যাদার কথা বলতে বলতে সে মাত্রাজ্ঞান হারায়। বলে, 'বুঝলে না মনমোহন, আমাদের বংশ হলো আদত জমিদার বংশ হে, রায়চৌধুরী বংশ। ও পাড়ার কেষ্ট সাঝির মতো নুন বেচে আমরা জমিদারী করি নি। আমাদের দাপট যেমন আছে, দান-খয়রাতও তেমনি আছে। কেষ্ট সাঝির বাবা রমণীরমণ কেষ্টকে কি বলতো বলি নি তোমাকে সে কথাটা?'

'কই না তো?' মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দেয় মনমোহন রায়। রাখালবাবু একটু হাসে। সযত্ন বর্ধিত গোঁফ জোড়ায় তা দিতে দিতে বলে, 'সে কথাই যদি না বলে থাকি তাহলে আর কি বললাম তোমাকে!'

'না তেমন আর বললেন কি?'

'আরে মুদি—মুদির চাল-চলনের কথা হে। কেষ্টর বাবা কেষ্টকে একদিন বলেছিল। সুন্দর একটি ছড়া কেটে বলেছিল। দাঁড়াও দাঁড়াও ছড়াটি আমি লিখেই রেখেছি। কই হে পতিতপাবন।'

পতিতপাবন মানে রাখালবাবুর বিশ্বস্ত ভৃত্য পতিতপাবন মণ্ডল। সেই পতিতপাবন এসে সমুখে দাঁড়াতেই রাখালবাবু হুকুম করল, 'যাও তো পাবন, তোমাদের কর্ত্রীমার কাছ থেকে আমার নোট খাতাটি নিয়ে এসো। ঐ নোট খাতায়ই আছে—বুঝলে হে মনমোহন, ঐ নোট

খাতায়ই আছে। আমি সেদিন শুনে এসে নিজ হাতে ছড়াটি লিখে রেখেছিলাম।'

পতিতপাবন গিন্নিমার কাছ থেকে নোট বইটি এনে রাখালচন্দ্রের হাতে দিল। রাখালচন্দ্র কয়েকটি পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ এক সময় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'এই যে···এই যে···বলেছিলাম না মনমোহন, এই নোট খাতাটায় আছে। এই যে এই দেখ না—

মুদির ব্যাটা মুদি হবি
বস্তা ঝেড়ে নুন খাবি।
যদি খাবি ঘি।
বেপার করবি কি?'

ছড়াটি পড়তে পড়তে একেবারে হোহো ক'রে হেসে উঠল রাখালচন্দ্র। হাসল মনমোহনও। রাখালচন্দ্রের থেকেও উচ্চকণ্ঠে হাসল সে।

রাখালচন্দ্র বলল, 'জমিদারী কিনুক আর যা-ই করুক বুঝলে না মনমোহন, কেষ্ট সাজি যে মুদি ছিল সেই মুদিই রয়ে গেল। এখন পর্যন্ত তার বস্তা ঝেড়ে নুন খাবার স্বভাবটি গেল না। সে আসবে কিনা এই রায়চৌধুরীদের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে?'

এই রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরীই এবারে সোনাক্ষেত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হয়েছে। লোকেদের কথায় 'প্রেসিডেণ্টো'।

না, প্রেসিডেণ্ট হয়ে রাখালচন্দ্র ভালোভাবেই কাজ শুরু করেছে। সোনাক্ষেতের প্রধান রাস্তা মানে যেটা বাজারের কাছ থেকে প্রায় 'চেরিটেবল ডিসপেনসারি' পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে, রাখালচন্দ্রের আমলেই সে রাস্তায় ইট পাতা শুরু হয়েছে। সময় সুযোগ পেলেই রাখালচন্দ্র তা নিয়ে বাহাদুরী করতে ছাড়ে না। বলে পীচের রাস্তা না করতে পারি, কিন্তু ইটের রাস্তা করবো তাতে আর ঠেকায় কে? বুঝলে হে মাঝির পো, সোনাক্ষেতের চেহারাটা আমি বদলে দেবো না।

বলতে বলতে একটা পরিতৃপ্তির আনন্দে রাখালচন্দ্রের মুখমণ্ডলটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, চেহারা বদলাচ্ছে বটে সোনাক্ষেতের। গত কয়েক বছরে সোনাক্ষেতে ছেলেদের হাই স্কুল হয়েছে। মেয়েদের জন্যে উচ্চ পাঠশালা বসেছে।

এ পাড়ায় সে পাড়ায় চার পাঁচটি 'টিউ কল' পাতাল প্রবেশ করেছে। সাব-রেজেষ্ট্রী আপিস এসেছে। সার্কেল ইন্‌সপেক্টারের আপিস এসেছে। পূর্বে ইণ্ডিয়ান টি বোর্ড থেকে সোনাক্ষেতের হাটে চায়ের প্রচার চলত। লোককে বিনে পয়সায় চা খেতে দিত। এখন সোনাক্ষেতের বাজারে দু' দুটি চায়ের দোকান হয়েছে। একটি পুণ্য চৌধুরীর 'চৌধুরী কেবিন', আর একটি হরিহর সাহার 'মায়া রেষ্টুরেণ্ট'। এখন লোকে সকাল বিকেল সেখানে চা খায়। পয়সা দিয়েই খায়।

সোনাক্ষেতের চেহারা বদলাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকের রুচিও পাল্টাচ্ছে। একটা পরিবর্তনের ঢেউ যেন বয়ে চলেছে সোনাক্ষেতের উপর দিয়ে। তাতে দোল খেতে খেতে সোনাক্ষেত যেন নতুন হয়ে সেজে উঠছে।

সোনাক্ষেতের সঙ্গে সঙ্গে রসিকচন্দ্রের জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। সে এখন তেরচা করে টেরি টানে। গায়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবি চড়ায়। চৌধুরী কেবিনের কোণে বসে চা খায়। ও বাড়ীর রাধাবল্লভ তো খোলাখুলিই বলে, ওখানে বসে শ্রীমান নাকি দু'চার কাঠি সিগারেটেরও সদ্‌ব্যবহার করে। তাছাড়াও বড় গুণ হয়েছে রসিকচন্দ্রের। পাড়ার সব শেষে পদ্মঠাকুমার বাড়ী। বাড়ীর পূব দিকে মজুমদারের চক। উত্তরে ঝোপ-ঝাড়। বাঁশ বন। দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে বাড়ী থাকলেও তা অনেক দূরে। পদ্মঠাকুমার বয়েস অনেক। জিজ্ঞেস করলে পদ্মঠাকুমা হাতের কর গুণে গুণে বলে, 'এই তো তিন কুড়ি তের, বয়েস আর তেমন কি হলো? আমার মা মরেছে চার কুড়ি বারতে, বাপ তো পাঁচ কুড়ির উপরেও পরমাই পেয়েছিল। আমিও কি আর সহজেই যাচ্ছিরে।' বলে হিহি ক'রে হেসে ওঠে পদ্মঠাকুমা।

কিন্তু বয়েস হলে কি হবে, পদ্মঠাকুমার গলাটা ভারি মিষ্টি। সেই মিঠে গলায় পদ্ম ঠাকুমা যখন গান গায় তখন কার সাধ্যি একটু দাঁড়িয়ে সে গান না শুনে যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এই গলার জোরেই বেঁচে আছে পদ্মঠাকুমা। সবাই তাকে ভালোবাসে। চালটা-কলাটা দেয়। এক বেলা তা কোন মতে ফুটিয়ে দু'বেলা খায় পদ্মঠাকুমা। সাত মুলুকে আপনার বলতে তার কেউ নেই। পদ্মঠাকুমা তাই যেন সবাইকেই আপন ক'রে নিয়েছে।

রসিকচন্দ্র রোজই পদ্মঠাকুমার বাড়ী আসে।

পদ্মঠাকুমা তার জীর্ণ দুটি ঠোঁট ছড়িয়ে হাসে। বলে, 'তুই আবার কেনে রে?'

'কেন, তোমার এখেনে আসতে নেই নাকি ?'

'তা থাকবে না কেন ? কিন্তু এ অবেলায় ?'

রসিকচন্দ্র একটু রস ক'রে বলে, 'অবেলায় না এলে কি খেলা জমে গো। বেলাবেলি তো সব্বাই খেলে। আমার খেলা অবেলায়।'

'তাতো বুঝলাম, কিন্তু ইস্কুলে গেলি নে ?'

'না, ও বরদা পণ্ডিতের ইস্কুলে আমার কিছু হবে না। দেখলে তো কেমন হিংসে ক'রে পর পর তিন বছর আমায় একই কেলাসে ফেলে রাখল ! লোকে বলে লিখতে পারি নি ? আরে চোখ খেকো ব্যাটারা, তোদের চোখের মাথা যদি না খেয়ে থাকিস্ তো তবে দ্যাখ্না আমার খাতায় একবার চোখ বুলিয়ে। আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত মাল একেবারে ঠেসে দিয়েছি। তোরা বলিস্ লিখতে পারি নি ? আরে, সব ব্যাপারেই ঐ বরদা পণ্ডিতের টিপ আছে। আসলে, বুঝলে না ঠাকুমা—'

'ঐ বরদা পণ্ডিত তোকে হিংসে করে ?' পদ্মঠাকুমার দুটি চোখ রহস্যময়।

'ঐ দ্যাখো, তুমি ঠিক ধরেছো। আমি বলতে না বলতেই তুমি বুঝে ফেলেছো। তাই বুঝলে না ঠাকুমা, তাই আমি ঠিক করেছি, ও বরদা পণ্ডিতের ইস্কুলে আর আমি যাবো না। ওখান থেকে নাম কাটিয়ে এনে আমি তোমার পাঠশালায় ভর্তি হবো।' বলে একেবারে হিহি ক'রে হেসে ওঠে রসিকচন্দ্র। তারপর হাতের বইগুলো বাইরের তক্তপোষের উপর ছুঁড়ে ফেলে সে গুনগুন ক'রে গান ধরে।

মাঝে মাঝেই এমন হয়। স্কুলে যাবার নাম ক'রেও স্কুলে যায় না রসিকচন্দ্র। কোন দিন বার বাগানে ঘুরে বেড়ায়। কোন দিন মজুমদারদের চক ঘুরে পদ্মঠাকুমার এখানে চলে আসে। পদ্মঠাকুমা তার হাতে গাছের আমটা কুলটা তুলে দেয়। তারপর তাকে ঘরে রেখে এ পাড়ায় সে পাড়ায় বেরোয়। দুঃখীর ধান্দার তো আর শেষ নেই !

একা ঘরে গড়াগড়ি খেতে খেতে রসিকচন্দ্র ভাবে, 'আহা, এ সময় গোলাপটা যদি একবার আসত ! এমন একটা 'চান্স'—

রসিকচন্দ্র কথায় কথায় দু'একটি ইংরেজী শব্দও ব্যবহার করে।

গোলাপ বড় হয়েছে। তার রূপ খুলেছে, রং পেকেছে। চোখ দুটি হয়েছে ভারি উজ্জ্বল। তার জন্যে তার বাপ গোপাল চক্রবর্তীর ভাবনার

অন্ত নেই। গোলাপ আজকাল বড় একটা বাড়ীর বার হয় না। বার হয় না নয়, গোপাল চক্রবর্তী তাকে বেরোতে দেয় না।

'তোমার মেয়েকে দেখলাম হে চক্কোত্তি, ঐ কবরেজ মশায়ের ছেলের সঙ্গে। কি যেন নাম ছোকরার? ঐ যে ক'বছর একই কেলাসে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে গো?'

'রসিকচন্দ্র।'

'হ্যাঁ, রসিকচন্দ্র। দু'জনেই দিব্যি হাসিখুশি। তা তোমাকে একটা কথা বলি চক্কোত্তি—'

'বলো।'

'এখন থেকেই সাবধান হও। মেয়ে আটকাও। পুরুষের সঙ্গে অমন চলাঢলি তো ভালো নয়। এখন বয়েস হয়েছে। কবে কোন্ অঘটন ঘটে যাবে। আগুন আর যৌবন এ দুটিকেই বিশ্বাস করতে নেই হে।'

কুমুদখুড়ো গোপাল চক্রবর্তীকে কতগুলো অযাচিত উপদেশ দিয়ে চটপট খড়ম বাজিয়ে চলে যায়।

গোপাল চক্রবর্তী খানিকক্ষণ একঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। কি যেন ভাবে। তারপর বাড়ী ফিরে গিন্নীর সঙ্গে মহা কোন্দল বাধিয়ে দেয়।

গোলাপের আর ক'দিন বাইরে বেরনো হয় না।

আবার কোন কোন দিন এমনও হয়।

গোপাল চক্রবর্তী পুজোয় চলেছে। পেছন থেকে মতির মা ডাকল, 'গোপালঠাকুর না?'

মতির মা চোখে ভালো দেখতে পায় না, কিন্তু তাই বলে লোক বাছতে তার ভুল হয় না। এ ক্ষেত্রেও তা হয় নি।

গোপাল চক্রবর্তী থমকে দাঁড়াল। মতির মা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমি বলি কি, বয়েসটা দিন দিন তোমার বাড়ছে না কমছে গোপাল?'

গোপাল চক্রবর্তী চমকে ওঠে। আজকাল তার এমনই হয়। হঠাৎ কেউ ডেকে বসলে কিংবা ঘুরিয়ে কথা বললে, গোপাল চক্রবর্তীর বুকটা কেমন যেন ঢিপঢিপ ক'রে ওঠে। কে জানে, কোন্ অশুভ সংবাদ তার জন্যে অপেক্ষা করছে! আর তার লক্ষ্য হয়তো তারই রূপবতী কন্যা গোলাপ। গোপাল চক্রবর্তী তা জানে। তবুও তাকে তা শুনতে হয়।

মতির মা পিঠে ছড়ানো আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে বলে, 'হ্যাঁগা,

তুমি কেমন ধারার বাপ গা গোপালঠাকুর? কেমন ক'রে যে তোমার গলা দিয়ে ভাত নামছে আমরা কিন্তু তা বুঝতে পারিনে বাপু।'

গোপাল চক্রবর্তী থতমত খায়? কি বলতে গিয়ে ও যেন আবার বলতে পারে না। মুখে কথা বেধে যায়।

মতির মা বলে, 'না, না, এতে রাগ করবার কিছু নেই ঠাকুর। আমরা তোমার পাড়া-পড়শী, বাতায় বাতায় ঘর। তাই খারাপ কিছু একটা দেখলে আমি পষ্ট কথা না বলে পারিনে। তেমন বাপের বেটিই নই আমি। তা দাও না ঠাকুর, একটা ছেলেটেলে দেখে মেয়েটাকে পার ক'রে দাও না। তুমিও রক্ষা পাও আর আমরাও দু' চোখ মেলে একটু চলাফেরা করি।' বলে মতির মা কি যেন একটা গোপন ইঙ্গিত করে। বর্বর ইঙ্গিত।

গোপাল চক্রবর্তী সবই বোঝে। এ সব কথায় প্রথম প্রথম মাথাটা তার চন্‌ ক'রে উঠত। কান দুটো লাল হয়ে যেত। কিন্তু আজকাল অনেকটা সামলে এনেছে গোপাল চক্রবর্তী। এ সব কথায় আজকাল আর তার রাগ হয় না। বড় জোর মনটা একটু খারাপ হয়। বড় জোর একটা সমস্যা তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। ঐ পর্যন্তই। ঠোঁটে একটু পাতলা হাসি টেনে সবাইকেই সে জবাব দেয়, 'তা আপনারা দশজন মুরব্বী মানুষ আছেন, দেখুন না একটু চেষ্টা-চরিত্রি ক'রে। আমি তো খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম। এখন আপনাদের দশজনের চেষ্টায় যদি মেয়েটার হাতে শাঁখা ওঠে, তা হলে আমি গরীব বামুন তরে যাই।'

গোপাল চক্রবর্তী মতির মাকেও সেই একই কথা বলল।

মতির মা বলে, 'তা বাপু, তোমার কথার ধরণই এই। কথায় বলে, যার বালা তার জ্বালা। মেয়ে হলো তোমার, তার পাত্র তুমি খুঁজবে। তার জন্যে কি হন্যি হয়ে ফিরবে নাকি কেষ্টা-বিষ্টে, গাঁয়ের আর দশজন? তোমার কথাগুলোই আমার ভালো ঠেকে না তা আমি তোমায় সোজাসুজিই বলে দিলাম ঠাকুর।'

গোপাল চক্রবর্তী কথা বাড়ায় না। এ-কথা সে-কথা বলে সে কোন রকম ক'রে মতির মার কাছ থেকে সরে পড়ে। মতির মা-ও বিড়বিড় করতে করতে এ-বাড়ী সে-বাড়ী টহল দিতে যায়। লোকে বলে পরের বাড়ীর হাঁড়ির খবর খসাতে যায়। এ কাজে তার পরম আনন্দ।

ঘরে আর গোলাপের মন টেকে না। গোপাল চক্রবর্তী গিন্নী কামিনী-সুন্দরী, মানে গোলাপের মাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিয়েছে, 'ঢ্যাখো, যা করো না করো, মেয়েকে যেন ঘর থেকে বেরোতে দিয়ো না।'

'কেন গো? এতটুকু মেয়ে ঘর থেকে বেরুবে না কি!'

'তুমি তো বললে এতটুকু মেয়ে, কিন্তু এ দিকে যে পাড়া-পড়শীরা—'

'মুখে আগুন, মুখে আগুন আঁটকুড়ের বেটিদের। মুখে আগুন সব ছেনালদের। কারো কাছে ধারি নাকি? না কারোরটা খাই, যে তাদের ভয় করতে হবে?'

'না, তবুও—' গোপাল চক্রবর্তীর সংকোচ জড়ানো কণ্ঠ।

'তোমার ওসব ফষ্টি-নষ্টি কথা শুনছি নে। আমার মেয়ে কিভাবে চলবে না চলবে সে আমি বুঝবো। ওর জন্যে আর কেউ দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।' বলে কামিনীসুন্দরী ধপধপ ক'রে পা ফেলে নিজের কাজে চলে যায়। গোপাল চক্রবর্তীও আর তাকে পিছু ডাকে না।

মুখে যা-ই বলুক না কেন, মনে মনে কামিনীসুন্দরীরও ভয় একটা কম ছিল না। বয়সের ধর্মটা সে-ও বোঝে। বিশেষ ক'রে যৌবনের ধর্মটা। একদিন তো তারও অমন সময় গেছে। ফাগুনের হালকা হাওয়া একদিন তারও বুকে পিঠে গড়িয়ে গেছে। মন তখন যেন অভিসারিকা হয়। কোথায় কোন্ প্রান্তে কোন্ নিকুঞ্জে যেন সে ঘুরে মরতে চায়। কোন্ রূপের আগুনে যেন সে পুড়ে মরতে চায়। শুভাকাঙ্ক্ষীদের সতর্ক দৃষ্টি না থাকলে অনেক সময় সে পুড়েও মরে।

তাই স্বামীকে দু'কথা শুনিয়ে দিলেও নিজে নিজে কিন্তু সাবধান হলো কামিনীসুন্দরী। গোলাপের বাইরে যাওয়া বন্ধ হলো। খুব একটা প্রয়োজন না হলে আজকাল আর সে বাইরে বেরুতে পারে না। আর কখনো কখনো বেরুলেও কামিনীসুন্দরী নিজে তার সঙ্গে থাকে। কাজেই গোলাপ কারো সঙ্গে সহজভাবে মেশবার, খোলাখুলিভাবে কথা কইবার সুযোগ পায় না। মজুমদার চকের চকচকে রোদ, সতীশ ঠাকুরের গন্ধরাজের গন্ধ তার মন টানে। কিন্তু আজকাল আর সে সেখানে যেতে পায় না।

রসিকচন্দ্রের জন্যে বড় প্রাণ কাঁদে গোলাপের। তার সঙ্গে আর সবদিন দেখা হয় না। হলেও কথা হয় না। রসিকচন্দ্র তাদের বাড়ীর পাশের রাস্তাটা দিয়ে গান গেয়ে যায়। গোলাপের গা'টা যেন শিউরে ওঠে। বুকের মাঝ-

খানটায় রক্ত যেন উথাল-পাথাল করে। সে দৌড়ে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। রসিকচন্দ্র তাকায় তার দিকে। বড় করুণভাবে। তাকায় গোলাপও। চার চোখে কথা হয়। লেখা হয়, ভাষাহীন এক অশ্রু সজল মহাকাব্য। দুটি প্রাণের পরম কথা।

কিন্তু এ সুযোগটুকুও গোলাপ রোজ পায় না। কোন দিন গোপাল চক্রবর্তী বাড়ীতে থাকে। কোনদিন রাস্তার আমগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে পাড়ার ষোড়শী রায়, বিধু পণ্ডিত, সাচাই সাহা প্রভৃতি স্বটলা করে। সেদিন আর জানালায় দাঁড়াতে পারে না গোলাপ। রসিকচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয় না। সেদিন কোন কিছুই তার ভালো লাগে না। সারাটা দিন তার মন কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে থাকে।

এ কি হলো তার! গোলাপ নিজেই ভাবে মাঝে মাঝে। কোন কিছুতে মন লাগে না। কোন কাজ ভালো লাগে না। সব সময়ই যেন তার মন রসিকচন্দ্রের কাছে পড়ে থাকে।

সদিপিসী যে রাধাকৃষ্ণের গান গায়, প্রেমের গান, মনের এই অবস্থার নাম কি তবে প্রেম! এই তো—শ্রীরাধার মতো তারও সে ভাব হয়েছে। এইতো প্রাণ তার উস্‌খুস্ করছে। দু' চোখ ভরে জল আসছে। মুখ শুধু করতে চাইছে রসিকচন্দ্র-রসিকচন্দ্র নাম। এর নাম—এর নাম কি তবে ভালোবাসা।

ভাবতে গিয়ে গোলাপের সারা দেহ যেন উষ্ণ হয়ে ওঠে। দুটো কান যেন ভোঁ-ভোঁ করে। দুটি রক্তকপোল আরও যেন রক্তিম হয়। দু'পাটি দাঁতে এক ফালি লাল তরমুজের মতো অধরকে কামড়ে বিক্ষত করে গোলাপ। দুটি গভীর চোখের দৃষ্টি কেমন যেন নরম হয়ে আসে।

কোন কোন দিন এমনও হয়।

গ্রীষ্মের ভ্যাপসা দুপুর। কামিনীসুন্দরী দুপুরের কাজ-কর্ম সমাধা ক'রে বাইরের উঠোনেই একখানি মাদুর পেতে শুয়েছে। বাইরের এ জায়গাটা ছায়া-ছায়া। ও-বাড়ীর একটা আমগাছ কিসের কৌতূহলে যেন উঁকি দিয়ে একেবারে এ-বাড়ীতে এসে গেছে। উঠোনের এ পাশটা তাই বেশ ঠাণ্ডা। কামিনীসুন্দরী দুপুরে এখানটায়ই গড়াতে ভালোবাসে। আজও শুয়েছে। গোপাল চক্রবর্তীও বাড়ী নেই। গোলাপ এতক্ষণ মায়ের পাশেই ছিল। মায়ের চুলে হাত চালাতে চালাতে মায়ের মুখে 'সাত ভাই চম্পা'র গল্প শুনছিল। গল্প

বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ল কামিনীসুন্দরী। এবারে গোলাপ উঠল। উঠে ঘরে গেল। খালি ঘর। কেউ নেই। গোলাপ আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। খিল দিল।

ঘরে খিল দিতেই সারাটা দেহ কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল গোলাপের। রক্তে কেমন যেন একটা নেশা লাগল। এতক্ষণ যে চম্পাবিবির প্রেমিক ফকিরের মুখে সে রসিকচন্দ্রেরই মুখ দেখেছে। চম্পাবিবির মনের কথায় সে নিজের মনের কথাই খুঁজে পেয়েছে। তাই শূন্য ঘরে খিল দিতেই মনটা কেমন যেন তার চন্ ক'রে উঠল। তাকে তুলে রাখা আয়নাটি নিয়ে সে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। আয়নায় নিজের মুখ দেখে দেখে নিজেকেই বুঝি গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলল গোলাপ। মনে মনে নানা কথা ভাবল। তার পর এক সময় আয়নাটি এক পাশে রেখে চুপচাপ চোখ বুজে রইল। কিন্তু ঘুম এল না। কোনদিনই আসে না এ সময়। চোখ বুজে সে অনেক স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন কি সত্য হয় না? সত্য হবে না? গোলাপের মনে বার বারই এ প্রশ্ন জাগে।

সেদিন মঙ্গলবার।

হাটের দিন। সকাল সকাল সকলেই হাটে গেছে। গোপাল চক্রবর্তীও বাড়ী নেই। গোলাপ এক কাঁড়ি থালা-বাসন নিয়ে ফকিরবাড়ীর 'গাথা'য় চলল।

ছোট ছোট বদ্ধ জলাশয়কে এ অঞ্চলে 'গাথা' বলা হয়।

যাবার আগে কামিনীসুন্দরী বলে দিল, 'বেশী দেরি করিস নে যেন, তোর বাবা এসে তোকে না দেখলে আমার উপর আবার তম্বি ঝাড়বেন।'

'ইস্, বাবা এখনই এল কিনা?'

'না রে না, তার কি কোন ঠিক আছে? যখন ইচ্ছে হয় বাড়ী চলে আসবে। সে তো আর কারো হুকুমের চাকর নয়।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি তাড়াতাড়িই চলে আসবো। কিন্তু বাসনগুলো মেজে আনতে হবে তো?'

তা মাজবি নে কেন? আমি বলছিলাম কি, বাসন মাজা হলেই সোজা বাড়ীতে চলে আসবি। কোন বাড়ীতে আবার টহল দিসনে।'

'তোমাদের সেই এক কথা? তুমিও যেমন, বাবাও তেমনি। কেন, আমি বুঝি বাড়ী বাড়ী টহল দিয়ে ফিরি?' বলেই গোলাপ আর

দাঁড়াল না। মায়ের জবাব শোনবার আগেই সে হনহন ক'রে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ফকির বাড়ীর 'গাথাটা' খুব বড় নয়। আর তা ছাড়া কোন পরিকল্পনা ক'রেও এটি কাটা হয় নি। ঘরের দেয়াল দিতে মাটির প্রয়োজন হয়েছিল। হলধর ফকির তাই এখান থেকে মাটি নিয়েছিল। মাটি নিতে নিতে যখন গর্তটা অনেক বড় হয়ে গেল, তখন হলধর ফকির বলল, 'নে নে, আর ক' কোদাল কাট। পাড় থেকে একটা ঢালু রাস্তাও কেটে দে। বাস্তু করতে গেলেই জলের প্রয়োজন। আর কোন কাজ না হোক, এই 'গাথা'র জলে বাসন-কোসনগুলোও তো মাজা-ধোয়া যাবে।'

হলধর ফকিরের কাটা এই 'গাথা'। আজ শুধু ফকির বাড়ীর মেয়েরাই নয়, পাড়া-পড়শীরাও এখানে বাসন মাজতে আসে। গোলাপও এই 'গাথায়' এসে বাসন মাজতে বসল।

এখন ভর দুপুর। 'গাথায়' আর লোক নেই। পানুর মা ছিল। সে-ও চলে গেল। গোলাপ এখন একা। মজুমদারদের শূন্য চক দুপুরের রোদে খাঁ-খাঁ করছে। চকের মাথার বিশাল পাকুড় গাছটি হাওয়ায় শিরশির করছে। ও পাশের গাব গাছটি থেকে দুটো কাক কা কা ক'রে ডেকে উঠল। আমের ডাল থেকে একটি মাছরাঙা পাখী জলের উপর ছোঁ মেরে একটি মাছ নিয়ে গেল।

হঠাৎ একটি ছোট্ট ঢিল এসে পড়ল গোলাপের পাশে যে হাতীশুঁড় গাছগুলো, তার মাথায়।

গোলাপ চমকে উঠল। এ-দিক ও-দিক তাকাল। কিন্তু কাউকে কোথাও দেখল না। মনে মনে হাসল সে। ভাবল, হয়তো পাড়ার কোন দুষ্টু ছেলে তাকে ভয় দেখাবার জন্যে আড়ালে দাঁড়িয়ে ঢিল ছুঁড়ছে। তা ছুঁড়ুক গে। গোলাপ তাতে ভয় পাবে না। মনে মনে আর একবার হেসে সে কাজে মন দিল।

কিন্তু একটু পরেই আবার একটি ঢিল এল।

এবার হাতীশুঁড়ের মাথায় নয়, 'গাথা'র পাশে যে কলাগাছগুলো, ঢিল পড়ল তারই দীঘল পাতায়। ঢিল লেগে কলাগাছের ক'টি পাতাই এক সঙ্গে কেঁপে উঠল। একটি পাতা মাঝখান দিয়ে ফেটে গেল।

এবারে গোলাপ পিছন ফিরে তাকাল।

পদ্মঠাকুমার উঠোনে রসিকচন্দ্র হাসছে।

ফকির বাড়ীর 'গাথা' থেকে পদ্মঠাকুমার বাড়ী বেশী দূরে নয়। 'গাথা'র উত্তরে ছোট্ট একটু জঙলা। তার পরই পদ্মঠাকুমার বাড়ী। পদ্মঠাকুমার উঠোনে দাঁড়ালে 'গাথা'র সব কিছুই দেখা যায়। রসিকচন্দ্র হাতের ইঙ্গিত ক'রে গোলাপকে সেখানে ডাকল।

প্রথমটায় গোলাপ কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। রসিকচন্দ্রকে দেখে খুবই আনন্দ হয়েছিল তার। মনটা যেন কলাপ ক'রে উঠেছিল। কিন্তু তবুও তার কাছে যেতে লজ্জা হলো গোলাপের। ভয় হলো। ঠোঁটে একটু হাসি ছড়িয়ে, দু'গালে একটু খুশীর আমেজ মেখে, মাথা নেড়ে সে জানাল, না, না। রসিকচেন্দ্রর কাছে সে যাবে না।

হাতছানি দিয়ে, চোখে একটা ইঙ্গিত করে রসিকচন্দ্র আবার ডাকল।

'আয় না, কেউ কোথাও নেই।'

এবারে গোলাপ আর থাকতে পারল না। 'গাথা'র জলে বাসনগুলো ডুবিয়ে রেখে সে পদ্মঠাকুমার বাড়ীতে গিয়ে উঠল।

রসিকচন্দ্র বলল, 'আয় না, ভেতরে আয়। ভেতরে আয় গোলাপ।' গোলাপ কথা কইল না। তার সারা শরীর যেন উষ্ণ হয়ে উঠল। দুটি গাল, দুটি কান আরও যেন লাল হয়ে গেল।

রসিকচন্দ্র হেসে বলল, 'ভয় কিরে? কেউ দেখবে না। কেউ কোথাও নেই। আয়, ভেতরে আয়, অনেক কথা আছে।'

সত্যি ঘরে কেউ নেই।

পদ্মঠাকুমা যেন কোন্ পাড়ায় গেছে। গান গাইতে। এটা সেটা চেয়ে-চিন্তে আনতে। এখনো সে ফেরে নি। বোধ হয় বিকেলের আগে আর ফিরবে না। কিন্তু গোলাপ ঘরে যেতে চায় না। কি একটা কথা ভেবে যেন তার মন পুলকে নেচে ওঠে। কি একটা রমণীয় ভাবনা যেন তার দীঘল দুটি চোখে স্বপ্ন মেলে। গোলাপ মনে মনে তার স্বাদ অনুভব করে। কিন্তু তবুও তার পা চলে না। বুক দুরদুর ক'রে কাঁপে। উত্তেজনার উত্তাপে গলাটা যেন তার বার বার শুকিয়ে আসে। কথা বলতে গিয়েও যেন সে কথা বলতে পারে না।

রসিকচন্দ্র তার দুটি হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যায়। ঘরে খিল টেনে দেয়। গোপাল দু'একবার মুখে শুধু 'না' 'না' বলে।

কিন্তু রসিকচন্দ্রের কাজে কোন রকম বাধা দেয় না।

রসিকচন্দ্র বলে, 'কি রে, ভয় করছে?' মিটিমিটি হাসছে রসিকচন্দ্র।

গোলাপ কথা বলে না। তার দুটি গালে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা দেখা দিয়েছে। হাতের চেটো দুটি অসম্ভব রকম ঘামছে। নাক ও কান দিয়ে একটা গরম ভাপ বেরুচ্ছে।

রসিকচন্দ্র আবার বলল, 'ভয় কিরে? পদ্মঠাকুমা নেই। কেউ দেখবে না। কেউ জানবে না।'

'তুমি খিল দিলে কেন?'

'দূর বোকা, ও কি কথা বলছিস তুই? খিল দেবো না কি রে! খিল না দিলে যে সব দেখা যাবে। শালা, পাড়ার যা লোক হয়েছে না, তাদের চোখ এড়িয়ে নিশ্চিন্তে দুটো কথা বলার জো নেই।' বলে রসিকচন্দ্র পকেট থেকে একটি সিগ্রেট বের ক'রে ধরাল। ঠোঁট দুটোকে গোল ক'রে ক'টি ধোঁয়ার কুণ্ডলী উপরের দিকে উড়িয়ে দিল।

গোলাপ বিস্ময়ে সে দিকে তাকিয়ে রইল।

রসিকচন্দ্র বলল, 'কতদিন তোকে দেখি নি গোলাপ।'

গোলাপ কথা কইল না! মাথাটি নীচু ক'রে চুপ ক'রে রইল।

রসিকচন্দ্র আবার বলল, 'আরও কত দিন এভাবে থাকবি বলতো?'

এবারেও গোলাপ কথা কইতে পারল না। দুটি টলটল করা চোখ একবার রসিকচন্দ্রের মুখের দিকে তুলে ধরেই আবার সে তা নামিয়ে নিল। সেই জল ছলছল দুটি চোখের পাতে যেন কত অব্যক্ত কথা, যেন কত গভীর বেদনার ইতিহাস লেখা ছিল। রসিকচন্দ্র তা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারল। বলল, 'ঠাকুরদা' তোকে খুব গাল-মন্দ করে—নারে?'

গোলাপ মাথা নাড়ল।

'না, না। তুই না করলে কি হবে, সে কথা আমি বুঝতে পারি রে। তোর চোখ-মুখ দেখে আমি বুঝতে পারি। মাঝে মাঝে তুই এসে জানালায় দাঁড়াস্, সত্যি কথা বলতে কি, আমি তখন তোর মুখের দিকে চাইতে পারি নে। আমার বুকটাতে কে যেন তখন ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে হাতুড়ির ঘা মারে।'

গোলাপ তার নীল শাড়ীর আঁচলটা দু'হাতে নিয়ে যেন খেলা করছে।

রসিকচন্দ্রের গলাটা যেন ভিজে আসে। বলে, ‘গোলাপ!’

‘রসিকদা!’

‘আয়, আমার কাছে আয় গোলাপ। আমার এ বুকের সঙ্গে আমি তোকে মিশিয়ে ফেলি। তোকে আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।’

‘রসিকদা!’

‘আমি যে আর পারিনে রে। তোকে না দেখে থাকতে পারি নে। মাঝে মাঝে বুকটা যেন কেমন ক’রে ওঠে। দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। শূন্য ঘরে বিছানায় পড়ে পড়ে আমি কাঁদি গোলাপ।’

বাইরে পদ্মঠাকুমার কণ্ঠ শোনা গেল, ‘ভজ মন অনুক্ষণ নন্দঘোষের নন্দনে।’

গোলাপ আর দাঁড়াল না। শাড়ীর আঁচলে দুটো চোখ ভালো ক’রে মুছে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি ‘গাথা’র দিকে চলে গেল।

পদ্মঠাকুমার কণ্ঠ তখন খুবই কাছে বাজছে, ‘ভজ মন অনুক্ষণ নন্দঘোষের নন্দনে।’

পাঁচ

আজকাল প্রায়ই এমন হয়। স্কুলে যাবার নাম ক'রে রসিকচন্দ্র বইপত্র নিয়ে সোজা এসে পদ্মঠাকুমার বাড়ীতে ওঠে।

পদ্মঠাকুমা দেখে খাঁখাঁ ক'রে বলে, 'এই ছাখো, আবার পালিয়েছিস্? আবার পালিয়েছিস্?'

রসিকচন্দ্র মুখে একটা বিষাদের ছায়া টেনে বলে, 'আরে, তুমি চুপ করো না ঠাকুমা, কোথা থেকে কে আবার শুনে ফেলবে।'

'শোনে তো শুনুক না, তাতে আমার হয়েছে কি?'

'না, তোমার আর কি হবে? হবে তো আমার। আমার পিঠের ছাল যাবে। বাবার কানে যদি এ কথা একবার ওঠে, তা হলে কি আর তিনি আমায় আস্ত রাখবেন? হাড়-গোড় ভেঙে আমায় ঘরে ফেলে রাখবেন না?'

এবার পদ্মঠাকুমা যেন একটু ঠাণ্ডা হলো। ঠাণ্ডা হবারই কথা। দুষ্টুমিতে ওস্তাদ হলেও পদ্মঠাকুমা রসিকচন্দ্রকে ভালোবাসে। স্নেহ করে। তার কিছু একটা ক্ষতির কথা শুনলেই সে মুষড়ে পড়ে। মুখে বলে, 'বালাই, বালাই, আমার বয়ে গেছে ভাববার জন্যে। আমি ভাববো কেন? তুই আমার কে? আমার কথার বাধ্য, না আর কিছু? তোর জন্যে মিছিমিছি আমি ভেবে মরবো কেন? হাড় ভাঙুক, মাথা ভাঙুক, তাতে আমার কি? আমার বয়ে গেছে তার জন্যে?'

কিন্তু তলে তলে পদ্মঠাকুমার মনটা সত্যি ভিজে ওঠে। এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে ফেলে বসে থাকে চুপচাপ।

রসিকচন্দ্র ডাকে, 'ও ঠাকুমা!'

পদ্মঠাকুমা প্রথমটায় কথা কয় না। মুখমণ্ডলে অসম্ভব গাম্ভীর্য জমা ক'রে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে।

রসিকচন্দ্র আবার ডাকে, 'ঠাকুমা!'

'না, না। তোর সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। কোন পিরিত নেই। ওরে আমার রসের নাগররে, লেখাপড়া ছেড়ে-ছুড়ে এখানে এসেছে রসের কথা কইতে। রসের ফাঁদ পাততে।'

'তার পর একটু থেমে, তুটো চোখে পিটপিট ক'রে চেয়ে বলে, 'সরে যারে ড্যাকরা ছোঁড়া, পিরিত আমি করবো না।'

বলতে বলতে পদ্মঠাকুমা নিজেই আবার হেসে ফেলে।

রসিকচন্দ্র বলে, 'মাঝে মাঝে তুমি এমন কাণ্ড ক'রে বসো না ঠাকুমা, তাতে মাইরি আমার ভয় ধরে যায়।'

'শুধু ভয় ধরবে না, এবার আমি নিজেই তোকে ধরিয়ে দেবো। তোর বাপকে বলে দেবো।'

রসিকচন্দ্র পদ্মঠাকুমার তুটি পা চেপে ধরে বলে, 'না, না, তুমি ও-কর্মটি করো না ঠাকুমা, তা হলে আর আমি বাড়ী ফিরতে পারবো না। বাবা আমায় দেখলেই লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে।'

'তা হলে বল্, আর ইস্কুল পালাবি নে, লেখাপড়ায় ফাঁকি দিয়ে ধেই-ধেই ক'রে আর বন-বাদাড়ে ফিরবি নে?'

'না, না। এই নাক মলছি, কান মলছি, আর ও কাজটি করবো না। কখনো করবো না।' বলে রসিকচন্দ্র সত্যি সত্যি বার তুইতিন নাক কান মলে ফেলে।

পদ্মঠাকুমা হেসে বলে, 'থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে। আর প্রায়শ্চিত্তিতে কাজ নেই। এবার থেকে যেন মনে থাকে।'

পদ্মঠাকুমা নিজের কাজে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

নাকই মলুক আর কানই মলুক, রসিকচন্দ্রের যেন কোন কথাই মনে থাকে না। তু'দিন পরেই আবার সে ইস্কুল পালায়। আবার পদ্মঠাকুমার বাড়ী এসেই হাজির হয়।

পদ্মঠাকুমা বলে, 'কি রে, আবার?'

'না, না, আমার আর হলো না গো, লেখাপড়া বুঝি আর হলো না। ইস্কুলের দিকে পা বাড়ালেই তোমার কথা মনে পড়ে। শুধু তোমার মুখটি মনে পড়ে। আর অমনি পা তুটি হনহন ক'রে ছোটে তোমার বাড়ীর দিকে। কিছুতেই আর আমি তাকে টেনে রাখতে পারি নে।'

পদ্মঠাকুমা তখন আর রাগ দেখাতে পারে না। রসিকচন্দ্রের গালে একটি

ঠোকনা মেরে হিহি ক'রে হাসে। আর অমনি গানের কলিতে টান দেয়,

'আমি পায় ধরা প্রেম করবো না

পায় ধরা প্রেম করবো না,

কৃষ্ণ যেন কুঞ্জে আসে না।

আমার কথা বুঝলে তো হে রসের নাগর?'

'তা আর বুঝবো না? অমন প্রাণের কথা আকার ইঙ্গিতেই বোঝা যায়। তা বুঝতে আবার কি লেখাপড়া লাগে নাকি?'

নিজের কথায় নিজেই হাসে রসিকচন্দ্র। তার পর গুনগুন ক'রে গান ধরে। পদ্মঠাকুমারই শেখানো গান,

'মনের কথা কই তোরে ভাই সুবল রে

আর জনমে হবো আমি রাধা,

(ওরে) ব্রজেশ্বরী কানু হইয়ে

(পড়বে) প্রেমের ফান্দে বাঁধা রে।

আর জনমে হবো আমি রাধা।'

গান হয়। কথা হয়। হাসাহাসি হয়। তার পর পদ্মঠাকুমা শাড়ীর পাড় জুড়ে জুড়ে বানানো থলেটাকে হাতে নিয়ে বলে, 'তা হলে আমি আসি নাগর। তুমি একটু জিরোও। আমি দুটো খুদ-কুঁড়ো যেচে নিয়ে আসি। চিত্তি ঠাণ্ডা ক'রে পরে আবার রসের কথা হবে।'

পদ্মঠাকুমা চলে যায়।

রসিকচন্দ্র ঘরে যায় না। পদ্মঠাকুমার উঠোনে একখানি চট পেতে বসে। কিন্তু তার দুটি চোখের দৃষ্টি পড়ে থাকে ফকির বাড়ীর 'গাথা'র দিকে। গোলাপ যদি সেখানে আসে।

ধীরে ধীরে বেলা গড়ায়। ফকির বাড়ার 'কাইলা' আম গাছটার মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে স্যিঠাকুর অনেকটা পশ্চিমে ঢলে পড়ে। পুবের-বন-শ্যাওড়া গাছের মাথায় ছায়া নেমে আসে। মজুমদার চকের পাকুড়-গাছটার মাথায় বসে একটা চিল মাঝে মাঝেই চিহিঃ…চিহিঃ…চীৎকার ক'রে ওঠে।

পাড়ার প্রেমানন্দের বৌ সোহাগী, মলিন বিশ্বাসের মা পোঁটন, সৌদামিনী অনেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে বাসন নিয়ে 'গাথা'য় আসে। বাসন মাজতে মাজতে তারা খেদার বোনের স্বভাব চরিত্রির কথা, কেষ্টতাঁতীর তৃতীয় পক্ষে বিয়ের কথা মায় কালীচরণের মেয়েমানুষ নিয়ে ঢাকায় থাকার কথা আলোচনা করে।

কার হাঁড়িতে চাল নেই, কার বাড়ীতে মাছ আসে নি, কার বৌ সবার অলক্ষ্যে দুধের সর চুরি ক'রে খায় প্রভৃতি মুখরোচক কথাও কোন কোন দিন এসে পড়ে। কাজেই বাসন মাজা হলেই তারা ঘরে যায় না। কোন কোন দিন সন্ধ্যা ঠেকিয়ে ঘরে ফেরে। রসিকচন্দ্রের সেদিন আর ভালো লাগে না। গোলাপ সেদিন 'গাথা'য় এলেও সে তাকে ডাকতে পারে না। দুটো কথা বলতে পারে না। সেদিনটি রসিকচন্দ্রের বৃথাই যায়। সেদিন সে মনে মনে জ্বলে-পুড়ে মরে।

কোন কোন দিন সুযোগ হয়। 'গাথা'য় কেউ থাকে না।

আগুন আগুন ভাদ্দরের রোদ। মাটিতে পা দিলে যেন পা পুড়ে যায়। গায়ে রোদ লাগলে যেন গা জ্বালা করে। অত রোদে কেউ বড় একটা বাইরে বেরোয় না। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসন-কোসন এক পাশে সরিয়ে রাখে। রোদ পড়লে তারা 'গাথা'য় আসবে। মাঝখানের সময়টুকু তাদের ছুটি। বিশ্রাম। গোলাপ কিন্তু সেই ফাঁকটুকুই খোঁজে। রোদ? রোদে কি করবে তার? না হয় শরীরটা একটু জ্বালা-জ্বালা করবে। মাথাটা চনচন করবে। তাতে ক্ষতি নেই। রোদ আছে বলেই না তার সুযোগ। রসিকচন্দ্রের সঙ্গে তার দেখা হবে। নইলে কি আর তার সে ভাগ্যি হতো! আহা, বেঁচে থাক রোদ। সারা বছর থাক।

গোলাপ মনে মনে রোদের প্রশস্তি গায়।

'গোলাপ!'

গোলাপকে দেখেই আজ ডাক দেয় রসিকচন্দ্র।

ফাঁকা জায়গা। ভয় নেই। কেউ শুনবে না।

গোলাপ বাসন নিয়ে 'গাথা'য় চলেছিল। রসিকচন্দ্রের ডাকে থমকে দাঁড়ায়। পিছু ফিরে চায়। হাসে। চোখ দুটি অসম্ভব দুষ্টুমিতে ভরে ওঠে।

রসিকচন্দ্র ডাকে, 'গোলাপ! শোন্। এ দিকে আয়।'

গোলাপ আবার হাসে। সঙ্গে সঙ্গে তার লাল কপোল দুটিও যেন হেসে ওঠে। বলে, 'আরে বাপু, একটু সবুর করো না, হাতের এগুলো আগে রেখে আসতে হবে তো? না এগুলো নিয়ে তোমার মাথায় চাপিয়ে দেবো!'

বলে গোলাপ দ্রুত চলে যায়। কিন্তু দেরি করে না। একটু পরেই ফিরে আসে।

বলে, 'বলো।'

রসিকচন্দ্র বলে, 'আয়।'

'কোথায়?'

'ভেতরে।'

'না, না। আমি ভেতরে যাবো না।'

'সে কি রে।' রসিকচন্দ্রের দুটি চোখ যেন বিস্ময়ে ভরা।

'হ্যাঁ, আমার ভয় করে।'

'ভয়? ভয় কি রে? ঘরে আর কেউ আছে না কি?'

গোলাপ কোন উত্তর দেয় না। রসিকচন্দ্রের দুটি চোখের দিকে চেয়েই আবার সে তার চোখ দুটিকে নামিয়ে নেয়। তার সারা দেহে কেমন যেন একটা শিহরণ লাগে। সে হাসে। শুধুই হাসে।

রসিকচন্দ্র তার দুটি হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যায়।

রসিকচন্দ্রের হাতে ধরা দিয়ে গোলাপের শরীরটা কেমন যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। রক্ত যেন দ্রুত চলাচল করে। দুটি কান অসম্ভব রকম গরম হয়ে যায়।

'গোলাপ!'

গোলাপ তক্তপোষের গায় বুকটা ঠেকিয়ে একটা বালিশের মধ্যে মুখ লুকোয়।

রসিকচন্দ্র ডাকে, 'গোলাপ!'

গোলাপ সাড়া দেয় না।

রসিকচন্দ্র তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'গোলাপ, ওঠ্, কথা শোন্।'

গোলাপ তবুও শোনে না। সাড়া দেয় না। দু'হাতে বালিশটা চেপে ধরে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

রসিকচন্দ্র বলে, 'কাঁদছিস?'

গোলাপের কান্না আরও বেড়ে যায়।

রসিকচন্দ্রের দুটি চোখও যেন টলটল ক'রে ওঠে। বলে, 'বামুনদা খুব জ্বালাতন করে, নয় রে?'

এবার গোলাপ মুখ তোলে। জলে দুটি কপোল ভিজে গেছে। দুটি গাল আরও লাল হয়েছে। সেখানে ক'টি অগোছালো চুল উড়ে এসে লেগে আছে।

রসিকচন্দ্র বলে, 'বল না রে, বামুনদা খুব গালমন্দ করে বুঝি?'

এবার গোলাপ কথা কইল। তার জল টলটল দুটি চোখ রসিকচন্দ্রের মুখের উপর তুলে ধরে বলল, 'পাড়ার নানা লোকে তোমার সম্পর্কে নানা কথা বলে। তুমি সিগ্রেট খাও, রাস্তায় রাস্তায় তুমি গান গেয়ে বেড়াও, লেখাপড়া কিছু করো না!'

'তাতে কি রে? কি হবে লেখাপড়া ক'রে? উত্তরপাড়ার ঐ অন্নদাঠাকুর সুর ক'রে বলে না, লেখাপড়া করে যে—গাড়ী চাপা পড়ে সে। বেশী লেখাপড়া করলে ঐ গাড়ী চাপা পড়েই মরতে হবে। গাড়ী-ঘোড়ায় আর চড়তে হবে না। এই ধর না গদু সাধুর কথাটা। পেটের ভেতর তো তার 'ক' অক্ষরটিও নেই। ছোটবেলায়ই এসে কাজে লেগেছিল শ্যামাচরণ সাহার গদীতে। তামাক সাজা থেকে শুরু ক'রে শ্যামাচরণবাবুর পা টেপার কাজটি পর্যন্ত তাকে করতে হতো। মাসে মাইনে ছিল নগদ আট আনা। আর আজ? আজ দেখ না, সেই গদু সাধু গুড়ের কারবার ক'রে হাজার হাজার টাকা কামিয়েছে। কেমন চক-মেলানো বাড়ী করেছে। দেখলে মাথা ঘুরে যায়। আর ঐ শশী রায়ের ছেলে শশাঙ্ক রায়? অ্যাং-ব্যাং-ঠ্যাং কত কি-ই না পড়ল। ঢাকা থেকেও নাকি লেখাপড়া করল। কিন্তু ফলটা কি হলো তার? গাঁয়ে থেকেই তো তাকে গরু চরাতে হলো! সকাল বিকাল ছাত্র ঠেঙিয়ে হাতে বুঝি তার ব্যথা ধরে গেল। তাই বলছিলাম কি, লেখাপড়া করলে কিছু হয় না। সবই এই কপালে করে।' বলে রসিকচন্দ্র তার কপালটি দেখিয়ে দিল।

আসলে এ কথাগুলো রসিকচন্দ্রের নয়।

যশোদাবাবুদের দেওয়ানজী রাধিকামোহন সাহা। রাধিকা দেওয়ানজী। সেই রাধিকা দেওয়ানজীই মাঝে মাঝে এ কথা বলে। রসিকচন্দ্র তার কাছ থেকেই অনেকদিন শুনেছে এ কথা। শুনে শুনে প্রায় মুখস্থ ক'রে ফেলেছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে অনেক জায়গায়ই সে এ কথা বলে বেড়ায়। গোলাপকেও সে এ কথা শোনাল।

শুনে গোলাপের চোখের জল শুকিয়ে গেল। দুটি চোখ যেন চকচক ক'রে উঠল। বাঃ, কি চমৎকার কথা বলতে শিখেছে রসিকচন্দ্র। কে বলে সে বোকা, হাবা! যারা তার নামে এ দুর্নাম দেয়, রসিকচন্দ্র তাদের সাত হাটে বেচে আসতে পারে!

রসিকচন্দ্র বলল, 'কি রে চুপ ক'রে রইলি যে? কথা কইবি নে বুঝি?'

'যাও, কথা কইবো না কেন?'

'এই তো কথা বলছিস নে?'

'বা রে, কথা বলবো কি? আমি যে তোমায় দেখছিলাম গো।'

এবারে রসিকচন্দ্র হেসে ফেলে। বলে, 'কি দেখছিলি রে?'

'ঐ যে বললাম, তোমায় দেখছিলাম, তোমার চোখ, তোমার মুখ দেখছিলাম। অবাক্ হয়ে তোমার কথা শুনছিলাম। বাব্বাঃ, অত কথাও তুমি বলতে পারো রসিকদা! তুমি উকিল হলে গাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা কামাতে পারতে।'

'ধুত্তরি, তোর উকিলের মুখে ঝাড়ু, আমি উকিল হতে যাবো কেন রে? উকিলরা তো মিছে কথা বলে। মিছে কথা বলা পাপ। আমি অত পাপ করতে যাবো কেন? আমার কিসের অভাব?' বলে এক গাল হাসল রসিকচন্দ্র।

গোলাপও হেসে প্রশ্ন করল, 'অভাব নেই?'

'থুড়ি, থুড়ি, অভাব নেই বলেছে কে? অভাব আছে। একটি জিনিসের অভাব আছে। তার জন্যে প্রাণ আমার আই-ঢাই করে। বুকটা যেন জ্বলে যায়।'

'বলো কি রসিকদা, এ-ও হয়? বুকও জ্বলে?'

'তুই বুঝবি কি রে? তোর কি প্রাণ আছে না কি?'

'না-গো না, আমার প্রাণ নেই। তা আর থাকবে কি ক'রে? আমার তো আর মনের মানুষ নেই?'

'নেই? মনের মানুষ নেই?'

হাসছে গোলাপ। তার চোখ-মুখ যেন হাসিতে ঝলসে উঠেছে।

রসিকচন্দ্র আবার বলল, 'কি রে, বল্ না, মনের মানুষ নেই?'

গোলাপ হেসে উত্তর দিল, 'না গো না, আমি তো আর তেমন পুণ্যি ক'রে আসি নি যে না চাইতেই আমার মনের মানুষ মিলবে!'

রসিকচন্দ্র বলল, 'দুষ্টু! মিথ্যেবাদী!'

গোলাপ হাসছে। তক্তপোষের উপর গড়িয়ে পড়ে হাসছে।

রসিকচন্দ্র আবার বলল, 'দুষ্টু, মিথ্যেবাদী।'

'মিথ্যেবাদী তুমি'—বলতে গিয়েই খিলখিল ক'রে হেসে উঠল গোলাপ।

রসিকচন্দ্র তাকে দু'বাহুতে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এবারে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলতো গোলাপ, আমি তোর কে ?'

গোলাপের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। শরীরটা ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠছে। একটা নতুন পুলকে যেন তা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তবুও সে হাসছে। অনেক দিনের অনেক খুশী যেন তার চোখ-মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। হেসে হেসেই সে বলল, 'বলবো ? সত্যি কথা বলবো ?'

'বল্।'

'সত্যি কথা বলবো ?'

'তোকে কি মিথ্যে বলতে বলেছি নাকি ?'

'সত্যি কথা বললে যে আবার তোমার ভালো লাগে না।'

'না লাগুক। সে আমি বুঝবো।'

'ও বাবা, এতদূর ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে বলি ?'

'এবারে ভণিতা রাখতো।'

গোলাপ তার টানাটানা দুটি চোখ রসিকচন্দ্রের মুখের উপর তুলে ধরল। তার দু'চোখের দুটি ঘন কালো তারা কেমন যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি আমার…'

'বল্।'

'তুমি আমার মনের মানুষ।' বলেই গোলাপ রসিকচন্দ্রের বুকে মাথাটা গুঁজে দিল। চুপ চাপ।

ছয়

আষাঢ় মাস। এখন বর্ষা। বর্ষায় সোনাক্ষেতের রূপটি সত্যি সুন্দর হয়। ধলেশ্বরী ভরে ওঠে কানায় কানায়। ওপারের চরগুলি সব জলের নীচে তলিয়ে যায়। পশ্চিম দিকে চাইলে মনে হয়, সোনাক্ষেতের পশ্চিমে যেন ছোট-খাটো একটি সমুদ্র বাতাসের ধমকে আকুলি-বিকুলি করছে। তার বুকে, এখানে সেখানে ছড়ানো গ্রামগুলি যেন জলের তলায় একবার ডুবছে, আর একবার ভাসছে।

এই বর্ষায় যামিনী চৌধুরীর মেয়ে লাবণ্যর বিয়ে হয়ে গেল।

যামিনী চৌধুরীর অবস্থা ভালো। সোনাক্ষেতের বাজারে তার পাকা গদী। মুদি-মালের কারবার। এই কারবারেই যামিনী চৌধুরী লাল। লোকে বলে লালে লাল। অর্থাৎ কিনা, এই কারবার থেকেই যামিনী চৌধুরীর বাড়ী-ঘর, জোত-জমা সব কিছু। তা ছাড়া বেশ কয়েক হাজার নগদ টাকাও যে তার সিন্দুকে এসে জমেছে সে বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ।

মেয়ের বিয়েতে খরচও করল যামিনী চৌধুরী।

পাড়া-পড়শী, শুধু পাড়া-পড়শী কেন সোনাক্ষেতের গণ্য-মান্য অনেকেরই পাত পড়ল তার বাড়ীতে। পাঁচটি গহনার নৌকা বোঝাই যে বরযাত্রী এসেছিল, তারাও আদর-আপ্যায়নে খুশী হয়ে যামিনী চৌধুরীর প্রশংসা ক'রে গেল।

মেয়ের বিয়েতে যামিনী চৌধুরী ঢাকা থেকে ইংরেজী বাজনা আনিয়েছিল। প্যাণ্ট পরা, উর্দি পরা সব বাজনদার। সোনাক্ষেতে এ বাজনার দল আর আসে নি। তাই দলে দলে লোক এসে 'ঢাকাই বাজনা' শুনে গেল। পাড়ার নাটুকে ছোকরারা যামিনী চৌধুরীকে ধরে দু'রাত যাত্রা গানেরও ব্যবস্থা করাল।

লোকে বলল, 'না, খরচ করলে বটে যামিনী চৌধুরী। মেয়ের বিয়েতে সবার উপরে টেক্কা দিল।

গোলাপ লাবণ্যর সই। পাতানো সই। কাপড় দিয়ে, খাওয়া-দাওয়া করিয়ে দু'জন দু'জনকে সই করেছিল। কাজেই বিয়ের ক'দিন গোলাপকে

চৌধুরী বাড়ীতে আসতে হয়েছে। খাটতে হয়েছে। হাসি-ঠাট্টায় দশজনের সঙ্গে মিলতে হয়েছে। এ ক'দিন আর রসিকচন্দ্রের সঙ্গে তার দেখা হয় নি।

সেদিন বুধবার। পূর্ণিমা। লাবণ্যর আজ ফুলশয্যা। আয়োজন খুব ভালোই হয়েছিল। বাড়ীর পশ্চিমের ঘরখানা সাজানো হয়েছিল সুন্দর ক'রে। সন্ধ্যা হ'তে না হতেই বাড়ীময় একটা সাড়া পড়ে গেল।

গোলাপের আজ আর অবসর ছিল না। সকাল থেকেই তার উৎসাহের অন্ত নেই। পাড়ার হারাণ, সদু, নাগরকে ধরে সে ফুল আনিয়েছে। আড়া-পাড়ার জমিদার বাড়ীর,ভাগলপুরের কিশোরী পণ্ডিতের বাগানের কোন ফুলই আর বাকী নেই। গোলাপ সে ফুল দিয়ে মালা গেঁথেছে, মাথার চূড়া, হাতের চুড় বানিয়েছে। মনের মতো ক'রে আজ সে লাবণ্যকে সাজাবে। কাজেই খোঁপায় দেবার জন্যে একটি মোটা মালা না করলে কি আর চলে? ও মা, চাঁপার পাপড়ি দিয়ে যে একটি শিকলি মালা গাঁথা হলো না! আর বনতুলসীর মালা? ঐ যা, সব কিছু একেবারে যেন ভুল হয়ে গেল। গোলাপ আবার নতুন ক'রে মালা গাঁথতে বসে। সারাদিন তার আর বাড়ী যাওয়া হয় না।

সন্ধ্যা হতে না হতে সে নিজ হাতেই লাবণ্যকে সাজাতে বসে।

লাবণ্য হেসে হেসে বলে, 'আমায় আর সাজাতে হবে না বাপু, আমার তো যা হোক একটা জুটেছে, এবারে নিজের ব্যবস্থা কর। নিজের রাস্তা দেখ।'

'সেটা কি আর তোকে বলতে হবে?' হাসতে হাসতেই গোলাপ উত্তর দেয়।

লাবণ্যর দু' চোখে চোখ রেখে আর একবার হাসল গোলাপ। একবার রহস্য ক'রে বলল, 'বলি, বন্ধুকে তোর কেমন লাগছে রে লাবণ্য?'

লাবণ্য বলল, 'মানে?'

'না, এই মিষ্টি না ঝাল সেইটে বল্ না?'

এবারে দুটি চোখকে বুজিয়ে নিল লাবণ্য। ঠোঁট দুটিকে একবার চেপে দিয়ে এক ঝলক হাসিকে ও যেন আটকে দিল। তার পর মুখটাকে অসম্ভব রকম গম্ভীর ক'রে বলল, 'ঝাল।'

'বলিস কিরে, সবে তো ঘণ্টা বাঁধলি, এরই মধ্যে আবার ঝাল লেগে গেল?'

'সে আর কি করবো ভাই, সবই বরাত।' বলতে গিয়ে আর হাসি চেপে রাখতে পারল না লাবণ্য। এবারে সে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

'রোজ' মাখা তার ছুটি লাল গালেও যে হাসির রঙ লাগল। সুর্মা-টানা ছুটি চোখও যেন একটা খুশীর.জোয়ারে চিকচিক ক'রে উঠল।

লাবণ্য বলল, 'আমিও কিন্তু আজ একটা কাজ করেছি গোলাপ ?'

'কি রে ?'

'উহুঁ, বলচি নে। বল্ কি দিবি ?'

গোলাপ রহস্য ক'রে বলে, 'নে, তোর 'তারে' দেবো।'

'উহুঁ, ও সব চালাকি চলবে না।'

'কি চাস তুই বলবি তো ?'

'কিছুই চাইনে।' বলে লাবণ্য আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

'আঃ, আমার মরণ আর কি ! তা হলে বল না কেন ?'

'বলবো ?'

'না, তোকে বলতে হবে না।'

গোলাপের মুখে একটা কপট ক্রোধের ছাপ।

লাবণ্য আর চেপে রাখতে পারল না। হেসে বলল, 'আমি কিন্তু খবর পাঠিয়েছি ?'

বিস্মিত হলো গোলাপ। বলল, 'কাকে ?'

'ঐ যে লো—'

'ঢঙ রাখ লাবণ্য, বল না কাকে ?'

'ঐ যে তোর মনের মানুষকে। রসিকদাকে।' পুঁটি পিসীকে ছুপুরে পাঠিয়ে ছিলাম। সে বলেছে আসবে।' গোলাপ হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে গেল। লাবণ্যর মাথায় ফুলের চূড়াটা বাঁধতে গিয়ে হাত ছুটি যেন তার কেঁপে উঠল।

লাবণ্য বলল, 'কি হলো রে ? অমন একটা সুখবর দিলাম, তা শুনে মুখটা তোর অমন কালো হয়ে গেল কেন ? ভয় নেই রে, তোর নাগরকে আর কেউ কেড়ে নেবে না। বাঁকা হোক, ভাঙা হোক, আমাদের কপালেও তো একটা জুটেছে !' বলেই মিষ্টি মিষ্টি ক'রে হাসতে লাগল লাবণ্য।

গোলাপ হাসল না। কি যেন একটা অজানিত ভয়ে মুখটা তার ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

আস্তে আস্তে বলল, 'কাজটা তুই কিন্তু ভালো করিস নি লাবণ্য ?'

'কেন রে ?'

'না অমনি, লোকের মুখে তো আর লাগাম নেই, পাড়ায় পাড়ায় যা ইচ্ছে তা বলে বেড়ায়। রসিকদা এখানে এলে—'

'লোকে যা ইচ্ছে তাই বলবে বুঝি?'

'আমার তো তা-ই মনে হয়।'

'ঐ লোকের ভয়েই তুই সারাটা জীবন উপোস দিয়ে পড়ে থাক গোলাপ, খাবার তোর হাতে তুলে দিলেও এ জীবনে আর তুই তা খেতে শিখবি নে।'

বলে লাবণ্য যেন মুখটা একটু ভার করল। গোলাপও আর কথা কইল না। ফুলের সাজি থেকে একটা বেলফুলের মালা তুলে নিয়ে লাবণ্যর গলায় পরিয়ে দিল। তার মনের গভীর থেকে যেন আচমকা একটা দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল। লাবণ্যও আর রসিকচন্দ্রের কথা তুলল না।

সরকার বাড়ীর বড় আমগাছটার মাথার উপর দিয়ে চাঁদ উঠেছে অনেকক্ষণ। দত্তদের কামিনী ফুলগাছটা যেন ফুলে ফুলে সাদা হয়ে গেছে। দক্ষিণা হাওয়ায় তারই একটা মিষ্টি সৌরভ ভেসে আসছে।

ফুলশয্যায় লোক কম হয় নি। লাবণ্যর মা বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলে এসেছে। তাই কেউ আর 'না' করতে পারে নি। পাড়ার বিলাসী, সৌদামিনী, গৌরের মা জুঁইমতি ও আরও অনেকে হাতের কাজ ফেলে রেখেও ফুলশয্যায় গান গাইতে এসেছে। বিলাসী আর জুঁইমতি গালে হাত দিয়ে গান গাইছে,—

'সখী, সাজাও, সাজাও, সাজাও আমার
বিজয় বসন্তেরে।
আমি এই চলিলাম মালা আনতে
মালিয়ার ঘরে ॥'

গোলাপও বসে ছিল না। লাবণ্যর অঙ্গসজ্জা শেষ ক'রে এবারে সে সৌদামিনীর জুড়ি হয়ে গান গাইতে বসেছিল। কিন্তু মনটা গানে বসে নি তার। বার বার তার দুটি চোখ শুধু এদিক-ওদিক করছে। লাবণ্য বলেছে রসিকচন্দ্র আসবে। সে নিজে তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছে। কিন্তু কই রসিকচন্দ্র? সবাই এল, এখনও কি তার আসবার সময় হলো না! না,

সে একা একা রসিকদার জন্যে ভাবলে কি হবে, রসিকচন্দ্র নিশ্চয়ই তার কথা ভাবে না। না, আর সে তার কথা ভাববে না। কিছুতেই না।

মনে মনে একটা অভিমান যেন জমে ওঠে গোলাপের। তার দু' চোখ ফেটে জল আসতে চায়।

সৌদামিনী বলে, 'আজ এমন হচ্ছে কেন রে গোলাপ?'

'কেমন পিসী?'

'বারে বারে গানের তাল কাটছে কেন? নে, নে, মন লাগিয়ে গা, এই তো তোদের গান গাইবার বয়েস। গলা নয় তো যেন কাঁচা বাঁশের বাঁশী।'

গোলাপ আবার চেপেচুপে বসে। মন লাগিয়ে গান গাইতে চেষ্টা করে।

কিন্তু না, গানে সত্যি মন লাগে না গোলাপের। সে জোর ক'রে গান গাইতে গেলেও মনটা কেমন যেন উন্মনা হয়ে যায়। ফুলশয্যার এত ফুল, এই আলো, এই গান তার মনে কেমন যেন একটা মোহের সৃষ্টি করেছে। চেষ্টা ক'রেও গোলাপ তাকে আর বাগে আনতে পারছে না। তাই সে উঠে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়ায়।

সৌদামিনী বলে, 'কেন, উঠলি কেন?'

গোলাপ বলে, 'শরীরটা ভালো নেই পিসী। মাথাটা কেমন যেন টনটন করছে।'

'তা শরীরেরই আর দোষটা কি বাপু, এ ক'দিন শরীরের উপর দিয়ে যা ধকল গেল, তাতে শরীর কি আর ভালো থাকতে পারে?' বলে সৌদামিনী আবার গানে মন দেয়।

জানালায় গিয়েই পথের দিকে চোখ ফেলল গোলাপ।

পূর্ণিমা রাত। পথ-ঘাট সব যেন ঝকঝক করছে। কাছের-দূরের সবই দেখা যায়। স্পষ্ট দেখা যায়। সরকার বাড়ীর মণ্ডপের পাশ দিয়ে বিধু পণ্ডিতের বাড়ীর গা ঘেঁষে যে রাস্তাটি বাজারের দিকে গেছে, গোলাপ অনেকক্ষণ ধরে সে রাস্তাটির দিকে তাকিয়ে রইল। পুঁটি পিসীর ছাগলগুলি এখনও ঘরে যায় নি। সরকারদের মাঠে এখনও খুঁটে খুঁটে ঘাস খাচ্ছে। ছুতোর বাড়ীর মরণ সূত্রধর বোধ হয় কোন একটি যাত্রা-বইয়ের মহড়া দিচ্ছে। পানের কারবারী বিপদভঞ্জন সেই—

'গুরু কি ধন চিনলি না মন, দেখলি না ভাবিয়া—মন পাগলা রে! সাধের দিন তোর যায় রে চলিয়া।

গানটি গেয়ে ঘরে ফিরল। জানালায় দাঁড়িয়ে গোলাপ সবই দেখল। সবই শুনল। কিন্তু রাস্তার কোথাও রসিকচন্দ্রের পাত্তা মিলল না। গোলাপের দু'চোখ ছেপে জল এল। সে আর ভাববে না। রসিকদা'র কথা কিছুতেই ভাববে না। কিছুতেই না।

'গোলাপ!'

চমকে উঠল গোলাপ। বুকটা যেন তার ধড়ফড়িয়ে উঠল।

'গোলাপ!'

বারান্দার ওপাশে ঐ যে ছায়া-ছায়া জায়গাটি,—ঐ যে যেখানে একটি শেফালী গাছের ডাল এসে পড়েছে, সেখানেই দাঁড়িয়েছিল রসিকচন্দ্র। অনেকক্ষণ এসেছে। ঘরে মেয়েদের ভিড়। তাই সে আর ঘরে যায় নি। এখানে, এই নিরিবিলি জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়ে সে অনেক কথা ভাবছিল। নীল-নির্জন আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে হয়তো চাঁদের সঞ্চার পথটি লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ ওধারের জানলায় তার চোখ পড়েছে। গোলাপকে সে দেখেছে। তাকে ডাক দিয়েছে। আস্তে আস্তে।

কিন্তু গোলাপ? গোলাপ কি করবে কিছুই ভাবতে পারে নি। মন চেয়েছে ছুটে যেতে। রসিকচন্দ্রের কাছে যেতে। কিন্তু ঘর ভর্তি লোক। কার দৃষ্টি তার উপর আছড়ে পড়েছে কে জানে! তাই প্রথমটায় ওখান থেকে সরে যেতে পারে নি গোলাপ। একটু দ্বিধা—একটা লজ্জা যেন তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

রসিকচন্দ্র আবার ডাক দিল, 'গোলাপ, এই গোলাপ।'

এবারে গোলাপ আর চুপ ক'রে রইল না। থাকতে পারল না। রসিকচন্দ্রকে সে ইঙ্গিত করে জানাল, সে আসছে। এতগুলো চোখ কটকটিয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। সে চাহনির সমুখ দিয়ে সে কিছুতেই যেতে পারছে না।

কিন্তু দেরিও করল না গোলাপ।

কি একটা ছল ক'রে সে পাশের ঘরে গেল।

সৌদামিনী ডেকে বলল, 'কি রে, শরীরটা কি খুবই খারাপ লাগছে? আমি একটু এসে বসবো তোর কাছে?'

'না, না, শরীর ভালোই আছে—শরীর আমার ভালোই আছে পিসী। এই আমি একটু ঘুরে আসছি। এই ওঘর থেকে আসছি।'

বলে গোলাপ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। সৌদামিনী একবার হাসল। আর কথা বাড়াল না।

রসিকচন্দ্র দাঁড়িয়েই ছিল।

জ্যোছ্না রাত। সোনাক্ষেতের সোনার রূপ। চাঁদের আলো মাঠের ঘাসে, গাছের পাতায় পড়ে চিকমিক করছে। দত্তদের কামিনী ফুল গাছটা থেকে কামিনী ফুলের একটা মিষ্টি সৌরভ এখানেও উড়ে আসছে। রসিকচন্দ্র এখানে দাঁড়িয়েই তা উপভোগ করছিল। পেছনের পায়ের শব্দে হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়াল।

'গোলাপ!'

'এলাম রসিকদা, পালিয়ে এলাম। পেছনের ঐ দরজা দিয়ে সকলের চোখ এড়িয়ে এলাম।'

'খাসা তো তোর বুদ্ধি হয়েছে রে!'

'তা হয়তো হয়েছে। মেয়েদের ওটা হয়।' একটু থেমে, একটু ভেবে তারপর বলল, 'কিন্তু আর কতকাল এমনি পালিয়ে পালিয়ে তোমার কাছে আসতে হবে রসিকদা?'

রসিকচন্দ্র হঠাৎ কথা কইতে পারল না। গোলাপ তার কাছে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। বহু কথা স্তব্ধ হয়ে থাকা তার দুটি অসহায় দৃষ্টি রসিকচন্দ্রের মুখের উপর তুলে ধরল। তারপর বুকের তলায় লুকিয়ে রাখা একটি বকুল ফুলের মালা টেনে বের ক'রে রসিকচন্দ্রের গলায় পরিয়ে দিল।

'এ কি! মালা!'

গোলাপ আর কথা কইল না। শুধু মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আজ সে রসিকচন্দ্রকে প্রণাম করল। তার দুটি চোখের কোণে সরু দুটি জলের রেখা।

সাত

গোপাল চক্রবর্তী চেষ্টা করছিল অনেকদিন থেকে। বয়েস তো আর নেহাত কম হলো না। এইতো পনেরো গিয়ে ষোলয় পড়ল। আর কদ্দিন ঘরে রাখা যায় গোলাপকে? সমবয়সী যারা ছিল তাদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। কারো কারো কোলে দু'একটি সন্তানও এসেছে। কখনো সখনো দেখা হলে তাদের দু'একজন গোপাল চক্রবর্তীকে ডেকে বলে, 'গোলাপের বিয়ের কি হলো ঠাকুরকাকা?'

তাদের মুখের দিকে চাইতেই যেন কষ্ট হতো গোপাল চক্রবর্তীর। তাদের সিঁথির সিন্দুরের রেখার উপর চোখ পড়লেই নিজেকে যেন অপরাধী বলে মনে হতো তার। কথা বলতে গিয়েও কথা যেন থেমে যেত।

'ও ঠাকুরকাকা! ঠাকুরকাকা!'

'আরে রেণু না? কবে এলি মা তুই? তা কেমন আছিস্ মা? জামাই বাবাজী ভালো আছেন তো? তোর শ্বশুর শাশুড়ী? কোথায় যেন তোর বিয়ে হয়েছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। সিমুলিয়া।'

এলোমেলো অনেক কথাই বলে ফেলে গোপাল চক্রবর্তী।

রেণু বলে, 'তা আপনার ছিচরণের আশীর্বাদে ভালোই আছি ঠাকুরকাকা?'

'বেশ বেশ, ভালো ভালো।' বলেই ছুটে যেতে চেয়েছে গোপাল চক্রবর্তী।

কিন্তু রেণু তাকে যেতে দেয় নি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্নই করেছে। শেষ পর্যন্ত বলেছে, 'এবারে গোলাপের একটা ব্যবস্থা করুন ঠাকুরকাকা। আর কদ্দিন ওকে ঘরে রাখবেন? ওরও তো একটা সাধ-আহ্লাদ আছে?'

রেণুর কথাগুলো পাকা গিন্নীর মতোই চোখা চোখা। তার প্রত্যেকটি তীরের মতো গোপাল চক্রবর্তীর বুকে গিয়ে বিঁধেছে। কিন্তু তাতে রাগ করে নি গোপাল চক্রবর্তী। নিজের কাছে যে সে নিজেই অপরাধী, অন্যের কথার সে কী উত্তর দেবে!

তবুও সে বলেছে, 'আমি কি আর কম চেষ্টা করছি মা? কিন্তু বিয়ের

কাজে তো আর জোর চলে না। বাগে ফুল ফুটলেই বে' হবে। ও প্রজাপতির লিখন। ও খণ্ডাবার শক্তি মানুষের নেই। তবে মনকে বোঝাবার জন্যে আমরা চেষ্টা করতে পারি শুধু।'

রেণু বলেছে, 'হুঁ, তাছাড়া আর কি! ঐটুকু করলেই যথেষ্ট। ঐটুকু করলেই হয়ে যাবে। ভগবান মুখ দিয়েছেন যখন তখন আহার দেবেনই, এই বলে ঘরে বসে থাকলেই তো আর খাবার ঘরে চলে আসবে না। তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে।'

চেষ্টা! চেষ্টা!

চেষ্টা কি আর কম করছে গোপাল চক্রবর্তী। ঐ তো শ্যামপুরের কানাই ঠাকুর, আরে বলতে গেলে কিছুই নেই ব্যাটার—সেই কানাইঠাকুরের হাত ধরে কেঁদেছে গোপাল চক্রবর্তী, 'আমার মেয়েকে একটু শ্রীচরণে ঠাঁই দিন ঠাকুরমশাই। আপনার ছেলে কুঞ্জর সঙ্গে—'

'আরে আপনি অমন করছেন কেন? আপনার মেয়ে তো আর ফেলনা নয়। সুশ্রী, সুন্দরী। অমন মেয়েকে ঘরের বৌ করতে পারলে যে আমারই খুশী হবার কথা।'

'সে সব আপনি বুঝবেন ঠাকুরমশাই, কিন্তু আমি আজ আর আপনার কথা না নিয়ে উঠছি নে।'

'আরে আমি উঠতে দিলে তো আপনি উঠবেন। এই ভরা রোদ্দুরে এতটা পথ হেঁটে এলেন। বসুন, বিশ্রাম করুন, এই গরীবের বাড়ীতে কষ্ট ক'রে দুটো মুখে দিন। তার পর বেলা পড়লে বিকেলের দিকে না হয় আস্তে আস্তে রওনা হবেন।'

গোপাল চক্রবর্তী তাই করেছিল। কানাইঠাকুরের কাছ থেকে কথা নিয়েছিল। তার পর অনেক হাসি-ঠাট্টা, রস-রসিকতা ক'রে সোনাক্ষেতে ফিরে এসেছিল।

বাড়ীতে ঢুকতেই উচ্ছ্বাসে সেদিন ফেটে পড়েছিল গোপাল চক্রবর্তী। পথ থেকেই আরম্ভ করেছিল, 'গিন্নি, গিন্নি, বলি—ও গোলাপের মা! গোলাপের মা কই গেলে গো!'

গোলাপের মা মানে কামিনীসুন্দরী নৈশ-ভোজের উদ্যোগ আয়োজন করছিল। রান্না-বান্না করছিল। সেই রান্না ঘর থেকেই সে যেন একেবারে খেঁকিয়ে উঠল, 'আ মরণ আমার, বুড়োর বয়েস বাড়ছে আর দিন দিন যেন

কচি খোকাটি হচ্ছেন। রস যেন উথলে উঠছে। গলায় সোমত্ত মেয়ে, সে দিকে হুঁশ নেই, পথে দাঁড়িয়ে কেমন রসিকতা আরম্ভ করেছেন! বুড়োর ঢঙ দেখে লজ্জায় মরি।'

'মরবে কি গো? আর মরবে না। মরতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে এসেছি। এক্কেবারে সব পাকা কথা। কই রে, গোলাপ, কইরে, একবার এক ছিলিম তামাক সাজতো মা। এতটা পথ হেঁটে এসেছি। একেবারে যেন দৌড়ে এসেছি।' বলতে বলতে গোপাল চক্রবর্তী বগলের ছাতাটি বেড়ার ফাঁকে ঝুলিয়ে রেখে পা ধুতে গেল।

কামিনীসুন্দরী এগিযে এসে বলল, 'কি ক'রে এল গো? কি পাকা ক'রে এলে?'

'কেন, গোলাপের বিয়ের কথা!'

'সে কি গো! কথাবার্তা নেই, গোলাপের বিয়ের কথা পাকা ক'রে এলে?'

'কেন, সে জন্যে আবার তোমার হুকুম নিতে হবে না কি?' বলেই একবার একটু ফিক করে হাসল গোপাল চক্রবর্তী।

গোলাপ তামাক সাজিয়ে হুঁকোটি বাবার হাতে দিয়ে গেল।

তামাক টানতে টানতে গোপাল চক্রবর্তী বলল, 'ছেলে এক্কেবারে খাসা, বুঝলে গিন্নি, ছেলে এক্কেবারে খাসা। ভাগ্যির জোর না থাকলে গরীবের মেয়ে এমন ছেলের হাতে পড়ে না।'

কামিনীসুন্দরী বলল, 'কার ছেলে গো? কোন্ গাঁয়ের ছেলে?'

'আঃ, তুমিও চেনো ছেলেকে। সোনাক্ষেতেই তার মামা-বাড়ী। আমাদের নবুঠাকুরের ভাগনে গো, শ্যামপুরের কানাইঠাকুরের ছেলে।'

এবারে কামিনীসুন্দরীর মুখখানি সত্যি হাসিতে ভরে উঠল। হ্যাঁ ছেলেকে সে চেনে বই কি! ভালোভাবেই জানে। এই না গেল বছর সে সোনাক্ষেতের ইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস দিয়েছে। হালে চাকরি করছে ঢাকা শহরে। কোন্ এক সরকারী আপিসে। এমন ছেলের হাতে মেয়ে দিতে পারলে কোন্ মা না খুশী হয়! কামিনীসুন্দরীও তাই খুশী হলো। গোপাল চক্রবর্তীরও সেদিন কদর বাড়ল বাড়ীতে।

পরদিন গোপাল চক্রবর্তী অনেককে ডেকে শুনিয়ে দিল কথাটা।

'কে, বুদ্ধুর বাপ না; আরে এসো এসো। তা কই চললে এত সকালে; ধামরাই হাটে বুঝি? সকালে না বেরোলে চলবে কেন? পথটা

তো আর নেহাত কম নয়! পাকা ছয় মাইল পথ। তার উপর এই রোদ ! তা একটু তামাক চলুক না হে। ঐ যে বলে, তাম্রকুটং মহাদ্রব্যং···। না, না, দেরি হবে না। এই তো সেজে ফেলেছি আর কি। তুমি দুটো টান দিয়েই চলে যেয়ো। তার বেশী আর তোমায় ধরে রাখবো না।'

তামাক সাজতে সাজতেই গোপাল চক্রবর্তী বুদ্ধুর বাপ হরমোহনকে কথাটা জানিয়েছিল। বলেছিল, 'মেয়ের তো একটা ব্যবস্থা করলাম গো বুদ্ধুর বাপ। শ্যামপুরের কানাইঠাকুরের ছেলে বৈদ্যনাথের সঙ্গে। আসছে আগনেই বিয়ে। ফাঁক দিলে চলবে না কিন্তু। আসতে হবে। কাজ করতে হবে। আমোদ-আহ্লাদ করতে হবে। তোমরা ছাড়া আমার আর আছেটা কে বলো দেখি? আগেও তোমরা, পেছনেও তোমরা। তোমরা দশজনই আমার আপন জন।'

হরমোহন সম্মতি জানিয়ে উঠে গিয়েছিল।

রাস্তা দিয়ে চলেছিল পুণ্যহর চৌধুরী। সোনাক্ষেতের সবার সেরা টি স্টল চৌধুরী কেবিনের মালিক।

গোপাল চক্রবর্তী তাকেও ডাকল, 'আরে অ··· অ···চধুরীর পো, অমন হনহন ক'রে ছুটছো কেন? তোমারও নাও ধরতে হবে নাকি? না— গোয়ালের গরু পালাল?'

বলতে বলতে একটু মুচকি হাসি হাসল গোপাল চক্রবর্তী। খুশীতে তার দুটি চোখের মণি চকচক ক'রে উঠেছে।

পুণ্যহর চৌধুরী কাছে এল। বলল, 'তা এত সকালেই আসর বসালে ঠাকুরকর্তা?'

'বসাবো না? আজ কি আমার কম আনন্দ হে! কাল যে মেয়ের কাজ পাকা ক'রে এলাম?'

'তাই নাকি? কোথায়?'

'এই কাছে ধারেই, শ্যামপুরের কানাইঠাকুর—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ চিনি চিনি। তার ছেলে বৈদ্যনাথকেও জানি।'

'সেই বৈদ্যনাথের সঙ্গেই, বুঝলে না পুণ্য, সেই বৈদ্যনাথের সঙ্গেই গোলাপের বে'। সামনের আগনেই। খাটা-খাটুনি কিন্তু তোমাদেরই করতে হবে ভাই। আমার কিন্তু আপন জন কেউ নেই!'

'সে জন্যে কি, সে জন্যে কি, আমরা যখন আছি তখন তোমার সবই

আছে। রক্তের সম্পর্কই কি সবচেয়ে বড় সম্পর্ক ঠাকুরকর্তা, মনের সম্পর্ক কি কিছুই নয়?'

'তা হবে না কেন? তা হবে না কেন? মনের মিল; সবচেয়ে বড় মিল। ভাইএর চেয়ে বন্ধু বড়, যদি বন্ধু বান্ধব হয়।' বলেই কথার সঙ্গে কথা মেলাতে গিয়েছিল গোপাল চক্রবর্তী। কিন্তু যখন পারল না, তখন নিজের অক্ষমতায় নিজেই হোহো ক'রে হেসে উঠল।

কিন্তু এ বিয়ে হয় নি।

লোকে বলে হবে কি ক'রে? সোনাক্ষেত থেকেই যে 'ভাঙানি' গিয়েছিল। খবর পাঠিয়েছিল নবুঠাকুর নিজে। মেয়ের স্বভাবচরিত্তির সন্দেহাতীত নয়। কাজেই ছেলের বাপ আর এদিকে এগোয় নি। মীরপুরের শ্রীনাথ চক্রবর্তীর মেয়ে পারুলকে বৌ ক'রে ঘরে এনেছিল।

বড় আঘাত পেয়েছিল গোপাল চক্রবর্তী। লজ্জায় যেন তার মাথা কাটা গিয়েছিল। ফলে দিন কয়েক আর ঘর থেকে বেরোয় নি সে। দিনরাত বিছানায় পড়ে পড়ে নিজেকে শুধু ধিক্কার দিয়েছে। স্ত্রী কামিনীসুন্দরী কিছু বলতে এলেই—রাগে তিন লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে গোপাল চক্রবর্তী। মুখে যা আসে তাই বলেছে। কামিনীসুন্দরী কিছু বলে নি। চুপ ক'রে গিয়েছে। হয়তো সে নিজেও অনেকটা দমে গিয়েছিল। তাই মুখে তার কথা বেরোয় নি। কথার বদলে দু'চোখ ভরে তার জল এসেছে। শুধু জল।

কিন্তু আজ বড় আনন্দ কামিনীসুন্দরীর।

আষাঢ়ের সন্ধ্যা। ফুরফুরে একটা মিষ্টি হাওয়া বইছে। সারাটা দিন গরম ছিল। অসহ্য গরম। সেই গরমেই কামিনীসুন্দরীকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে হয়েছে। হবে না কেন? ধামরাই থেকে কুটুম এসেছে। গোলাপের আজ পাকাদেখা। যাক, এ্যাদ্দিন পরে ভগবান তবে মুখ তুলে চেয়েছেন। এখন ভালোয় ভালোয় কাজটা হয়ে গেলে হয়। আবাগীর বেটীরা ভারি মুখ নেড়ে কথা বলে। তাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিতে পারে কামিনীসুন্দরী। গাঁয়ে কে কত বড় সতী কামিনীসুন্দরীর তো তা অজানা নেই। নেহাত মেয়েটি গলায় ঠেকেছে। তাই পাঁচজনের পাঁচ রকম কথাই সইতে হয়েছে তাকে। নইলে ঝাঁটা মেরে সবার ঘাড়ের ভূত নামিয়ে দিত না সে? তার

মুখের সামনে দাঁড়াবে কি না ঐ কুচুকুড়ে মুখপুড়ী বেটীরা! ঝাঁটা-মারো, ঝাঁটা মারো মুখে। আগে গোবিন্দের কৃপায় সাত-পাকটা শেষ হোক, তার পর কোন্ মাগীর ঘাড়ে ক'টি মাথা তার একবার খোঁজ নেওয়া যাবে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সারাদিন কামিনীসুন্দরীর এই কথাগুলোই মনে হয়েছে।

মতির মা এসে ডাক দিয়েছে, 'বামুন বৌ কই গো?'

'এসো, এসো দিদি। বসো। পান খাও।'

মতির মা একখানি পিঁড়ি পেতে কামিনীসুন্দরীর কাছেই বসেছে। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলাটা নামিয়ে আস্তে আস্তে বলেছে, 'শুন্‌ছি কি গো বৌ?'

হঠাৎ যেন চমকে উঠেছে কামিনীসুন্দরী। চমকে ওঠা দুটি চোখকে মতির মা'র মুখের উপর তুলে বলেছে, 'কি শুনলে দিদি?'

'না, ঐতো ওরা বলাবলি করছিল—'

একটা দ্বিধায় গলাটা যেন জড়িয়ে জড়িয়ে আসে মতির মা'র। কথা বলতে গিয়েও যেন সে বলতে পারে না। মুখের কথা খসে না। মুখেই আটকে থাকে।

কামিনীসুন্দরীর বুকটা যেন টিপটিপ ক'রে উঠে। চারিদিকে তার শত্রুর অভাব নেই। তার ভালো তো তারা সইতে পারে না! কেউ আবার কোন কথা লাগাল না তো পাত্র পক্ষের কানে? সোনাক্ষেতে তো আর হিংসুটের অভাব নেই।

সে তাই তাড়াতাড়ি বলল, 'কি? কি শুনলে দিদি? কি বলাবলি করছিল ওরা?'

মতির মা আর একবার ঢোক গিলল। আর একবার এদিক-সেদিক তাকাল। তারপর গলাটা খুব খাটো ক'রে বলল, 'বর নাকি লো হাবা বৌ?—একেবারে নাকি আকাট মুখ্যু? ভালো ক'রে নাকি কথাটাও বলতে জানে না?'

এবারে ঠিক জায়গাটিতে ঘা পড়েছে কামিনীসুন্দরীর। মনের সেই দুর্বল স্থানটিতে। অনেক চেষ্টায় যে জায়গাটির কথা ভুলেছিল সে, মতির মা'র কথায় সে জায়গাটি একেবারে অনাবৃত হয়ে গেল। হ্যাঁ, ছেলে তেমন চালাক-চতুর নয়। বেশী কথাও বলে না। কথা বলতে জানে না। শুধু অন্যের

কথায় খিলখিল ক'রে হাসে। হরমোহনের কাছ থেকে সব খবরই নিয়েছে কামিনীসুন্দরী। শেষ পর্যন্ত হরমোহন বলেছে, 'যে যা বলুক না ঠাকুর মা' লেখাপড়া একটু কম জানলেও ছেলে একেবারে ফেলনা নয়। তাছাড়া ধামরাই বাজারে ছেলের বাপের মস্ত বড় কারবার। কত কম কর্মচারী। ও বাড়ীতে মেয়ে পড়লে মেয়ে তোমার সুখেই থাকবে। তুমি চোখ বুজে কাজখান ক'রে ফেলো।'

হরমোহন—এই হরমোহনের কথায়ই শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছে কামিনী-সুন্দরী। নইলে গোপাল চক্রবর্তী যখন নিজে তুলেছিল প্রস্তাবটা, তখন সে তাকে আমল দেয় নি মোটেই। বলেছিল, 'না, না। ওসব হবে না। মেয়ের আমার বিয়ে না হোক, মেয়েকে বস্তায় ভরে ধলেশ্বরীতে ডুবিয়ে দি—সে-ও ভালো, তবুও ঐ হাবা-বোকার হাতে গোলাপকে আমি তুলে দিতে পারবো না। না—না, কিছুতেই না।'

গোপাল চক্রবর্তী বুঝিয়েছিল, 'না গো না। তুমি যে কথা শুনেছো, তা মোটেই সত্যি নয়। আমি নিজে দেখেছি ছেলেকে। নিজে কথা কয়েচি—

কথা শেষ হয় নি গোপাল চক্রবর্তীর। মাঝখানেই খেঁকিয়ে উঠেছিল কামিনীসুন্দরী। বলেছিল, 'না, না, তোমার কোন কথা শুনিনে, শুনতে চাইনে। তোমার কি? এখন মেয়ে হয়েছে তোমার পথের কাঁটা। এখন তাকে কোনমতে ঠেলেঠুলে সরাতে পারলেই তোমার পথ খোলসা। তুমি তো এখন সে-ই চেষ্টায়ই আছ।'

বলতে বলতে জলে ভরে এসেছিল কামিনীসুন্দরীর ডাগর ডাগর দুটি চোখ। গোপাল চক্রবর্তী আর কথা বাড়ায় নি। সেদিনের মতো চুপ ক'রে সে বাইরে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত হরমোহনই রাজী করিয়েছিল কামিনীসুন্দরীকে। বলেছিল, 'ঠাকুর মা, কাজখান ছেড়ো না গো, ছেড়ো না। সপ্তাহে দু'দিন যাই ধামরাই হাটে। আমরা জানি শ্রীহরি চক্কোত্তির কদর। কত মেয়ের বাপ তার মেয়ে গছাতে—শ্রীহরি চক্কোত্তির ঘাটে পাড়া গেড়ে থাকে। এ সব তো আমাদের নিজ চোখে দেখা ঘটনা। প্রত্যয় না হয়, চলো একদিন আমার সঙ্গে। তোমাকেও একবার দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

না, আর ধামরাই যায় নি কামিনীসুন্দরী। হরমোহনের কথাই বিশ্বাস করেছে সে। মত দিয়েছে। পাত্রপক্ষ ইতিমধ্যেই দু'বার কনে দেখে গেছে। এ

পক্ষও একবার নাও ভরে ধামরাই গিয়ে বেড়িয়ে এসেছে। কথাবার্তা যা হবার তা আগেই হয়ে গেছে। শ্রীহরি চক্রবর্তী সোজাসুজিই বলেছে, 'মশাই, আমি কুটুম্বিতা করবো আপনার সঙ্গে। আপনাকে কি বিপদে ফেলে যা আপনার সাধ্য নয় তা আদায় ক'রে নেবো? ওসব কসাইপনা আমার কাছ থেকে পাবেন না। এ শ্রীহরি চক্কোত্তি মোটেই ওপথ মাড়াতে রাজী নয়।'

খুশী হয়েছে গোপাল চক্রবর্তী। খুশী হয়েছে আর দশজন। অনুরোধ করেছে, কাজ পাকা করার জন্যে।

আজ শ্রীহরি চক্কোত্তি নিজেই কাজ পাকা করতে এসেছে। পাকাদেখা দেখতে এসেছে।

গোপাল চক্রবর্তীর বাড়ীতে আজ একটি ছোটখাটো উৎসব।

সেই উৎসবের হাটেই মতির মা একটা বেসুরো কথা শোনাল।

কথা শুনে হঠাৎ যেন চমকে উঠল কামিনীসুন্দরী। কিছুক্ষণ যেন থম্ ধরে বসে রইল। একটু হেসে সে বলল, 'এ্যাদ্দিন ওরা কোথায় ছিল দিদি?'

'কাদের কথা বলছো গো বামুন বৌ?'

'ঐ আমার মেয়ের জন্যে আজ যাদের দরদ উথলে উঠছে। আমি বলি, এ্যাদ্দিন তারা কোথায় ছিল?'

মতির মা হঠাৎ যেন কোন কথা বলতে পারল না।

কামিনীসুন্দরীই বলল, 'আমার হয়ে তাদের তুমি বলে দিয়ো দিদি, হাবা হোক, কানা হোক ঐ ছেলের সঙ্গেই কাজ হবে। আমার গোলাপকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করার সুযোগ আমি আর তাদের দেবো না।'

বলে কামিনীসুন্দরী কি একটা কাজে ভেতরে চলে গেল। বাইরের ঘর থেকে ততক্ষণে শুভ শঙ্খধ্বনি উঠছে। বোধ হয় গোলাপের পাকাদেখা হয়ে গেল।

আট

দাওয়ায় বসে পদ্মঠাকুমা গান গাইছে। হাতের লাঠিটা কাছে। ঝুলিটা পাশে। এখনই তাকে বেরোতে হবে। বেরোবার আগে মনটাকে একটু হালকা করছে পদ্মঠাকুমা। হালকা করছে গান গেয়ে।

'ওরে ললিতে
এত রাইতে বাঁশী বাজায় কে ?
তারে ডাইকা দে।
বাঁশীর সুরেতে রে হইরা নিল প্রাণ
আমি সীন্তার সিন্দুর বান্ধা থুইয়া শোন্‌বো বাঁশীর গান।
বাঁশীর সুরেতে রে হইরা নিল প্রাণ
আমি আখের কাজল বান্ধা ধুইয়া শোন্‌বো বাঁশীর গান।
তরলা বাঁশের বাঁশী তাতে সপ্ত ছেদা,
কদম্ব হিলানে বাঁশী বলে রাধা রাধা।
বাঁওয়ার বাঁশী নয় রে, কালিয়া নাগের বিষ।
বাঁশীর মইধ্যে থাইক্যা নাগে দেয় রে দারুণ শিস্‌।
মরাল বাঁশী না-রে তরই বাঁশের আগা,
অবলা নারীর জানে দিল কত দাগা॥'

পদ্মঠাকুমার এটা অভ্যাস। পাড়ায় বেরোনোর আগে রোজই সে গান গাইবে। অধিকাংশ দিনই রাধা-কৃষ্ণের বিচ্ছেদের গান। এ সময় যেন অন্য গান তার মুখে আসে না। কে জানে পদ্মঠাকুমার এ দুঃখময় জীবনের অন্তরালে আরও গভীর দুঃখের কোন্ অশ্রু-সজল কাহিনী লুকিয়ে আছে! দুঃখের বেসাতী শুরু করবার আগে হয়তো প্রতিদিনই তাই সে সেই দুঃখের ইতিবৃত্তটাই স্মরণ ক'রে নেয়।

এখনও বেলা বেশী হয় নি। পুবের সূর্যটা সবে মজুমদার চকের শ্যাওড়া গাছটির মাথায় উঠেছে। একটা হলুদ রোদ গড়িয়ে পড়েছে এখানে সেখানে। আষাঢ়ের এই প্রসন্ন সকালে পথঘাট যেন হাসছে।

রসিকচন্দ্র কোথায় ছিল কে জানে! হঠাৎ সে মজুমদার চকের ওদিক থেকে যেন ছুটে এল। চোখেমুখে একটা চঞ্চলতার ছায়া। এলোমেলো অগোছালো চুলগুলি সকালবেলার শিরশিরে হাওয়ায় ফুরফুর ক'রে উড়ছে।

'ঠাকুমা!'

পদ্মঠাকুমার গান গেল থেমে। উঠল চমকে। বলল, 'একি রসিক-নাগর! একি ছিরি হয়েছে তোমার?'

অন্যদিন হলে রসিকচন্দ্রও দু'একটি রসের আখর দিত। পদ্মঠাকুমার তোবড়ানো চিবুকটি ধরে হয়তো একটু নাড়িয়েও দিত। কিন্তু আজকে সে ওসব কিছুই করল না। সে পথই মাড়াল না। বরং কণ্ঠে একটা উদ্বেগের স্বর ঢেলে বলল, 'গোলাপ—গোলাপ এসেছিল ঠাকুমা?'

পদ্মঠাকুমার নিষ্প্রভ দুটি ঠোঁটে যেন একটা হালকা হাসি খেলে গেল। ছানি-পড়া দুটি ড্যাবডেবে চোখে তার একটা হঠাৎ আলোর ঝিলিক যেন জ্বলে উঠল। বলল, 'গোলাপ আর আসবে কেন রে? তার যে বিয়ে?'

'সে আমি জানি।'

'তবে?'

'জানিনে।' বলে আবার মজুমদার চকের দিকেই ফিরে চলেছিল রসিকচন্দ্র। বুঝিবা তার দুটি চোখ টলটল ক'রে উঠেছিল। পদ্মঠাকুমা খপ্ ক'রে তার ডান হাতটা ধরে ফেলল।

বলল, 'এলে আর অমনি ফিরে চললে কেন রসিকনাগর? বলি কোন্ চন্দ্রাবলী কুঞ্জে বসে তোমার জন্যে প্রহর গুণছে?'

রসিকচন্দ্রের চোখ থেকে ঝরঝর ক'রে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

পদ্মঠাকুমা তাকে পাশে বসাল। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। তারপর সস্নেহে বলল, 'যাকে প্রয়োজন, তাকে জোর ক'রে টেনে রাখতে পারো না নাগর?'

রসিকচন্দ্রের মাথাটা যেন নুয়ে এল। চোখ থেকে আরও ক'ফোঁটা জল মাটিতে পড়ল।

পদ্মঠাকুমা আবার বলল, 'জোর যদি তোমার না-ই থাকে, তাহ'লে আর ভালোবাসা কেন? ভালোবাসা তো আর দুর্বলের জন্যে নয়!'

'তুমিও আমায় দুর্বল ভাবলে ঠাকুমা?'

'সবল ভাবতেও তো ভরসা পাইনে ভাই।'

পদ্মঠাকুমার বুক থেকে একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বাতাসে উড়ে গেল। তার ছানি-পড়া দুটি চোখও যেন টলটল ক'রে উঠল।

রসিকচন্দ্র বলল, 'ভরসা পাও না? কেন?'

'ইনিয়ে বিনিয়ে তা বুঝানো যায় না নাগর। সেটা মনের কাজ। মনই তার খবর রাখে। তবে এটা বুঝি, ভালোবেসে কত রাজকুমার রাজতক্তের লোভ ছাড়ল, কত মানুষ পথের কাঙাল হলো, তবুও ভালোবাসাকে ছাড়ল না। ভালোবাসার সে জোর তোমার নেই। তুমি বোধ হয় ভালো লাগাকেই ভালোবাসা বলে ভুল করছো।'

'ঠাকুমা।'

পদ্মঠাকুমাকে হঠাৎ প্রণাম ক'রে উঠে পড়েছিল রসিকচন্দ্র। দু'চোখের জল শুকিয়ে গেছে তার। একটা উদ্দীপনায় দুটি চোখ যেন আশ্চর্যভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পদ্মঠাকুমা বলল, 'ওকি, হঠাৎ অমন ক'রে উঠলে কেন? আমার কথাগুলি মনে খুব বিঁধেছে বুঝি?'

'না, গোলাপকে সেই কথা বলতে চললাম ঠাকুমা।'

হঠাৎ একবার থামল রসিকচন্দ্র। আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সে। সব কথা ঠিক মতো বলতে পারছে না। কথার পিঠেই কথা আটকে যাচ্ছে। একটু থেমে আবার বলল, 'গোলাপকে সেই কথাই বলতে চললাম ঠাকুমা। বলতে চললাম, গোলাপ আমার বাগে কুঁড়ি থেকে তুমি ফুল হয়ে ফুটেছ, আমায় তুমি এতকাল গন্ধ দিয়েছ। আজ আমাকে নিঃস্ব ক'রে, একেবারে কাঙাল ক'রে তুমি চলে যাবে গোলাপ? আমায় ছেড়ে যেতে মন তোমার কাঁদবে না? একটুও লাগবে না? না, না, আমি তা দেবো না। আমি তোমায় যেতে দেবো না গোলাপ। আমার বাগ থেকে কাউকে তোমায় ছিঁড়ে নিতে দেবো না। তুমি আমার—চিরকাল আমার।' বলে আর দাঁড়াল না রসিকচন্দ্র। যে পথে সে এসেছিল সেই পথেই আবার চলে গেল।

পদ্মঠাকুমা হাসল। হাসতে হাসতেই তার চোখ থেকে ক'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। আঁচলে তা মুছে নিল। তারপর মাটি থেকে লাঠি আর থলিটা তুলে নিয়ে সে পাড়ায় বেরুল। একটা গানের কলি তার নিষ্প্রভ দু'ঠোঁটে ঘুরঘুর ক'রে গেল—

'আমি ঝাঁপ দিলাম প্রাণ গৌর বলে
প্রাণ সখিরে···
আমার যা থাকে কপালে।'

'গোলাপ, এইখানে, এই নির্জন শেফালীতলায় দাঁড়িয়ে তুই তোর মনের কথা বল্ গোলাপ। বল্, তুই কি চাস্। এখানে শুধু তুই আর আমি। দু'পাশে দুটি মাধবীলতা থরথর ক'রে কাঁপছে। ক'টি কলাপাতা সরসর ক'রে নড়ছে। এখানে-আর কেউ নেই। আর কোন সাড়া নেই। এখানে মন খুলে নির্ভয়ে তোর মনের কথা বল্ গোলাপ। সে কথা শুধু আমি শুনবো। সে কথা শুধু আমারই কানের কাছে ঘুরে ঘুরে সংগীতের মতো বাজবে।

গোলাপ! এতটুকু বয়েস থেকে দুটিতে আমরা বেড়ে উঠেছি রে। আমরা যেন একই বোঁটায় দুটি ফুল। আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে লোকে হেসে খুন হয়েছে। বন্ধু-বান্ধবেরা হাসি চেপে বলেছে, মানিকজোড়। আজকে কি সে জোড় তুই ভেঙে যাবি গোলাপ? তা হলে একা একা আমি থাকবো কেমন ক'রে? থাকবো কি নিয়ে? গোলাপ, তুই চোখ মেল। কথা বল গোলাপ। একবার, শুধু একবার তুই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল, সত্যি কি তুই আমায় ছেড়ে যেতে চাস্?'

মজুমদার চকের এ ধারটা, পুঁটিপিসীর বাড়ীর এ পাশটা সত্যি খুব নিরিবিলি। উঠোনের 'টাল' ছাড়িয়ে একটা লাউগাছ অনেকটা এদিকে ঢলে পড়েছে। একটা শেফালাগাছ অজস্র পাতার মুকুট মাথায় নিয়ে এ জায়গাটাকে যেন ঢেকে রেখেছে। তা ছাড়া আছে ক'টি মাধবীলতার ঝাড়। মাধবীলতার ডগাগুলি এলোমেলো গড়িয়ে গেছে এদিকে সেদিকে। কাজেই ভেতরে না ঢুকলে বাইরে থেকে জায়গাটির কিছুই দেখবার উপায় নেই।

গোলাপ ফকির বাড়ীর 'গাথা'য় এসেছিল। দূর থেকেই তাকে লক্ষ্য করেছিল রসিকচন্দ্র। লক্ষ্য ক'রেই সে ছুটে এসেছিল পদ্মঠাকুমার বাড়ীতে। ভেবেছিল, নিশ্চয় গোলাপ তাকেই খুঁজছে। তার দুটি অসহায় ভীরু চোখ তার কাছেই আশ্রয় চাইছে। সে আসবে, নিশ্চয়ই সে আসবে তার কাছে, পদ্মঠাকুমার বাড়ীতে। কিন্তু না, পদ্মঠাকুমার বাড়ীতে। দূর থেকেই হয়তো তার গান শুনতে পেয়েছে গোলাপ। তাই আর হয়তো সে

যায় নি ওখানে। ফকির বাড়ীর 'গাথা'য়, সে কাজ করতে বসেছে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে এদিক সেদিক চাইছে। হয়তো সে খুঁজছে—রসিকচন্দ্রকেই খুঁজছে।

রোজই এমন সময় লোকজন বড় একটা কেউ থাকে না গাথায়। সকাল সকাল কাজ সেরে যে যার বাড়ীতে চলে যায়। বাড়ীতে এ সময়টায় বাজার আসে। এ সময়ে মাছ কুটে, আনাজ-তরকারি বানিয়ে সবাই রান্নাবান্নার আয়োজন করে।

আজও আর কেউ ছিল না 'গাথা'য়। একা একা বসেই গোলাপ বাসন মাজছিল। মা রান্নায় লেগেছে, বাবাও গেছে পাশের কোন্ গ্রামে বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে। কাজেই খুব তাড়াতাড়ি আজ আর বাড়ী ফেরার তাড়া নেই গোলাপের। সে এদিক-সেদিক চাইছে, মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ ক'রে কি যেন ভাবছে।

হঠাৎ পুঁঠি পিসীর বাড়ীর ওদিক থেকে একটি ঢিল এসে টুপ ক'রে তার সামনে পড়ল।

শেওড়া ডালে বসে যে মাছরাঙা পাখীটি মাছের দিকে তাক করছিল, ঢিলের সঙ্গে সে উড়ে গেল। ঢিলের আঘাতে 'গাথা'র জল ক্রমবর্ধমান ক'টি বৃত্তের সৃষ্টি ক'রে চারদিকে গড়িয়ে গেল।

গোলাপ মুখ তুলে চাইল সেদিকে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। কি একটা কথা ভেবে যেন তার দুটি লাল কপোল আরও লাল হয়ে গেল। ঝুরুঝুরু হাওয়ায় তার শাড়ীর আঁচল মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিল, গোলাপ আঁচলটি উঠিয়ে বুকে ছড়িয়ে দিল।

আবার একটি ঢিল এসে পড়ল তার পাশে।

এবারে ফিক ক'রে হেসে ফেলল গোলাপ। দেখল, পুঁটি পিসীর বড় আম গাছটার আড়াল থেকে রসিকচন্দ্র তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। গোলাপও হয়তো এই সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে আর দেরি করল না। একবার শুধু এদিক-সেদিক তাকাল সে। লোকজন কে কোথায় আছে দেখল। তার পর বাসনগুলি গাথার জলে তলিয়ে রেখে সে রসিকচন্দ্রের কাছে চলে গেল।

'গোলাপ!'

রসিকচন্দ্রের কাছে যেতেই সব কথা যেন ফুরিয়ে গেছে গোলাপের। সে

কথা কইতে পারল না। মাথা নীচু ক'রে সে রসিকচন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

রসিকচন্দ্র আবার ডাকল, 'গোলাপ।'

এবারও রসিকচন্দ্রের ডাকে সাড়া দিল না গোলাপ। একটা আবেগে হয়তো গলাটা তার বন্ধ হয়ে এসেছিল। সে সাড়া দিতে পারল না। কেবল দু'হাতে শাড়ীর আঁচলটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করল।

'গোলাপ।'

এবার চোখ তুলল গোলাপ। রসিকচন্দ্রের মুখের দিকে চাইল। কিন্তু চোখে চোখ পড়তেই ঝরঝর ক'রে আবার তার চোখে জল নেমে এল।

গোলাপের কাছে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে এল রসিকচন্দ্র। দু'হাতে তার নরম মুখটি তুলে বলল, 'গোলাপ।'

'রসিকদা।'

'তোর মনের কথাও কি তাই?'

'কি রসিকদা।'

'আমায় ছেড়ে তুই দূরে যেতে চাস?'

গোলাপ এ কথার জবাব দিতে পারল না।

রসিকচন্দ্র বলল, 'বল্ গোলাপ। এতটুকু বয়েস থেকে যে স্বপ্ন দেখে এসেছি আমি, যে প্রতিমা গড়েছি মনে মনে, সে কি ভুল? সে কি মিথ্যে? বল্ গোলাপ! একবার শুধু বল্। তোর মুখ থেকে সে কথাটি শুনে আমি এখান থেকে চলে যাই।'

গোলাপ নিরুত্তর।

'কথা বলবি নি? ওঃ বুঝেছি।' বলে হাত নামিয়ে নিল রসিকচন্দ্র। বুক থেকে তার একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে গেল।

বলল, 'আমি জানতাম রে, ছেঁড়া আঁচলে কোন দিন চাঁদ বাঁধা যায় না। আমি লেখাপড়া করি নি, আমি মুখ্যু; কি আছে আমার? কেন তুই আমার কাছে থাকবি? আমার কাছে থাকলে যে দিবানিশি বুকে তোর কাঁটা ফুটবে। তার চেয়ে সেই ভালো, তুই দূরে যা। তুই সুখী হ।' বলতে বলতে রসিকচন্দ্রের দু'চোখ বেয়ে ঝরঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়ল।

গোলাপ এবার নিজেই রসিকচন্দ্রের কাছে এল। নিজের হাতে রসিক

চন্দ্রের হাত দুটি তুলে নিল। তার পর বলল, 'সে রাতের কথাটা এরই মধ্যে ভুলে গেলে রসিকদা?'

রসিকচন্দ্র যেন গোলাপের কথার মানে খুঁজে পেল না। তাই জলভরা চোখে সে গোলাপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

গোলাপ বলল, 'বকুলের মালা কি এরই মধ্যে ছিঁড়ে গেছে রসিকদা? বকুলের গন্ধ কি এরই মধ্যে নিঃশেষ হয়েছে?'

'না, না। সে মালা কোন দিনই ছিঁড়বে না গোলাপ, সে গন্ধ কোনদিনই নিঃশেষ হবে না। সাতরাজার ধন এক মানিক্যির মতো আমি বুকে ক'রে সে মালাকে আগলে রাখবো।'

'তবে?'

রসিকচন্দ্রের মুখে কথা নেই।

'তবে? তবে সেই মালার জোরে তোমার নিজের জিনিসকে নিজে তুমি ধরে রাখো না রসিকদা? কেন তুমি নিজেই সে মালার বাঁধনকে ছিঁড়ে ফেলছো। কেন তুমি তোমার নিজের জিনিসকে অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছ?' বলতে বলতে গোলাপ রসিকচন্দ্রের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। তার বুকে মাথা রাখল। রসিকচন্দ্রের দু'চোখের জল ছাপিয়ে একটা আনন্দের দ্যুতি যেন ফুটে উঠেছে।

নয়

সেদিন রাজেন দত্ত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এল। রোজই সন্ধ্যায় বাড়ী থেকে বেরোয় রাজেন দত্ত। এখানে-সেখানে এক-আধটু বসে, এক-আধটু গাল-গল্প ক'রে তারপর সে সতীশঠাকুরের বাড়ীতে যায়।

পাড়ার এক কোণে সতীশঠাকুরের বাড়ী। পূর্ব-দক্ষিণে দুটো এঁদো গাথা। পশ্চিমে মস্ত বড় একটা বাঁশ ঝাড়। উত্তরে যশোদাবাবুদের অনেকটা পতিত জায়গা পড়ে আছে। এ পথে লোক চলাচল খুবই কম। জায়গাটা তাই নিরিবিলি।

এই সতীশঠাকুরের বাড়ীতেই রোজ রাতে আড্ডা জমে। গাঁয়ের প্রভাবশালী বেশ ক'জন মহাশয় ব্যক্তি রোজ রাতে আসে সে আড্ডায়। গান বাজনা হয়। বেশ কয়েক কলকে বাবা ভোলানাথের প্রসাদও পোড়ানো হয়। তারপর রাত যখন গভীর হয়ে আসে, সোনাক্ষেতের সমস্ত কোলাহল যখন থেমে যায়, তখন তারা যে-যার বাড়ীর দিকে রওনা হয়। তাদের চোখের দিকে তখন তাকানো যায় না। প্রত্যেকের চোখই ডুগ্‌ডুগে লাল। যেন রক্তের স্রোত উথলে উঠে সেখানে এসে জমে গেছে।

রাজেন দত্তেরও বাড়ী ফিরতে রাত অনেক হয়।

কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরল রাজেন দত্ত। রাত তখন বোধ হয় ন'টাও হয় নি। সারা পাড়া, সারা বাড়ী জেগে। বাজারেরা এখনও বাড়ী আসে নি। হাটুরেরা এখনও হাট থেকে ফেরে নি। সরকার বাড়ীর মণ্ডপে কারা যেন কীর্তন আরম্ভ করেছে।

বাড়ীতে পা দিয়েই রাজেন দত্ত হাঁক দিল, 'অনাথ! অনাথ!'

অনাথ দত্ত-বাড়ীর পুরনো চাকর। সারাটা দিন শরীরের উপর দিয়ে ধকল গেছে তার। খাটাখাটুনি গেছে। এখন প্রায় অবসর। এই অবসরে অনাথ তাই তুলসীতলার এ পাশটায় বসে একটু তামাকু সেবনের আয়োজন করছিল। কিন্তু বাবুর ডাকে চমকে উঠল। হাতের কলকে মাটিতে রেখে সে ছুটে এল।

'আমায়—আমায় ডাকলেন কর্তা।'

'হ্যাঁ, রসে কোথায় ? রসে—' রাজেন দত্তের কথাটা যেন অসম্ভব গম্ভীর শোনাল।

চমকে উঠল অনাথ। রাজেন দত্তের এ রূপ তার কাছে অপরিচিত নয়। অত্যন্ত উত্তেজিত হলে রাজেন দত্তের কণ্ঠটা এমনি গম্ভীর শোনায়। সেটা বহু ক্ষেত্রে বহুবার দেখেছে সে। তাই প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেল অনাথ। কথা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। গলায় যেন আটকে গেল।

ধমকে উঠল রাজেন দত্ত, 'হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? বল্ না রসে কোথায় ? রসে ?'

'খোকা যে এখনো ঘরে ফেরে নি কর্তা।'

'ঘরে ফেরে নি ?' রাজেন দত্তের দুটি চোখ যেন দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল। কণ্ঠস্বরটা আরও যেন শানিত হলো।'

'ঘরে ফেরে নি ? আজগর আলি ? বাহাদুর ?'

'তারাও কেউ বাড়ী নেই।'

'বাড়ী নেই ? কৈ গেল সব অপগণ্ডের দল !'

'আজগর বাড়ী গেছে। আর বাহাদুর গেছে বাজারে—।'

'আর তুই ? তুই তবে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? যা, রসেকে ধরে নিয়ে আয়। যেখানে পাবি হাত-পা বেঁধে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে আসবি। যা—দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? যা···'চেঁচামেচিতে গিন্নী সরযুবালা এসে পড়েছিল। সে-ই এবার বলল, 'কোথায় যাবে অনাথ ? ওকে অমন ক'রে ধমকাচ্ছো কেন ?'

'তুমি এখানে ? তুমি আবার এলে কেন ?'

'আসবো না কি গো, ও কি কথা বলছো তুমি ?'

অনাথ চলে গেল। এবারে যেন একটু শান্ত হলো রাজেন দত্ত। দুটি বড় বড় চোখ ফেলল সে সরযুবালার মুখের দিকে। বলল, 'না না। আসবে বই কি ! আসবে বই কি ! রত্ন প্রসবিনী তুমি জননী, তোমার রত্নের গুণকীর্তন শুনতে আসবে বই কি ! তোমায় আসতেই হবে।' রাজেন দত্তের কণ্ঠে একটা ব্যঙ্গ যেন ঝলক দিয়ে ওঠে।

'রহস্য রাখো। বলো না এত তাড়াতাড়ি আজ ফিরলে কেন ? কি হয়েছে ?'

'পাড়াটা একবার ঘুরে এসো। কি হয়েছে তখন নিজেই টের পাবে।'

'আমি তোমার কাছ থেকেই শুনতে চাই।' সরযুবালার কথাটা যেন হুকুমের মতো শোনায়।

রাজেন দত্ত একটু চুপ ক'রে থাকে। কি যেন ভাবে। তারপর বলে, 'তোমার ছেলের জন্যে লোকসমাজে আর বুঝি মুখ দেখানো যায় না।'

সরযুবালা যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কথায় কথায় খোঁচা মারাটা রাজেন দত্তের চিরকালের স্বভাব। সরযুবালা সব সময় তা সহ্য করতে পারে না। আজও পারল না। রাজেন দত্তের কথায় সে যেন একেবারে জ্বলে উঠল। বলল, 'ভণিতা রাখো, কি হয়েছে সব কথা আমায় খুলে বলো।'

'বলবো, হ্যাঁ, বলবো, তার আগে—'

রাজেন দত্ত কথা শেষ করতে পারল না। প্রায় ছুটতে ছুটতে অনাথ ঘরে এল। বলল, 'বাবু! বাবু! খোকা এসেছে। খোকা এসেছে।'

'এসেছে? কৈ সে? কোথায় সে? যা ওকে ধরে নিয়ে আয়। টেনে নিয়ে আয়।' রাজেন দত্তের কণ্ঠটা ইতিমধ্যেই আবার উচ্চগ্রামে উঠে গেছে।

অনাথ ফিরেই চলেছিল। কিন্তু সরযুবালা তাকে পেছন থেকে ডাকল, 'অনাথ।'

'মা।'

দ্রুত চলা পা দুটি হঠাৎ যেন থেমে গেল অনাথের। সরযুবালা বলল, 'তুই তোর কাজে যা অনাথ, ডাকতে হয় আমিই খোকাকে ডেকে আনবো।'

'না।'

রাজেন দত্তের কণ্ঠ এবারে যেন অসম্ভব গম্ভীর শোনাল।

সরযুবালা বলল, 'না? না কেন?'

'কথাটা আমি ওর মুখ থেকেই শুনতে চাই।'

'আচ্ছা, সে পরে হবে।'

'পরে নয়, পরে নয়। এখনই। এক্ষুনি।'

'না, এখন নয়। জানো, সারাদিন ও বাড়ী আসে নি। কিছু খায় নি। কে জানে কোথায় ভরা দুপুরে—ভরা রোদ্দুরে টোটো ক'রে ফিরেছে। আগে ওকে জিরোতে দাও, দুটো মুখে দিক, তারপর—'

'না।'

রাজেন দত্ত এবারে যেন গর্জে উঠল!

বলল, 'অনেক—অনেক প্রশ্রয় তুমি ওকে দিয়েছো। অকালে ওর মাথাটি

খেয়েছো। আর নয়, আর নয়। পদ্মর মুখ থেকে যে কথা আজ শুনেছি যদি তা সত্যি হয় তাহলে জেনো, সারা জীবন আমি ও কুলাঙ্গারের মুখদর্শনও করবো না।' উত্তেজনায় রাজেন দত্ত ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। দুটি চোখ যেন তার অসম্ভব রকম জ্বলে উঠেছে। সরযুবালা চলে গেল।

হ্যাঁ, পদ্মঠাকুমাই রাজেন দত্তকে কথাটা বলেছিল। রাজেন দত্ত চলেছিল সাহাপাড়ার পথ দিয়ে। পথে পদ্মঠাকুমার সঙ্গে দেখা।

'এই যে পদ্ম! তা কেমন আছিস আজকাল?' পদ্মঠাকুমাকে রাজেন দত্তই প্রথমে সম্বোধন করেছিল।

পদ্মঠাকুমা বলেছিল, 'দুঃখী কাঙালীর আবার থাকা আর না থাকা। এই তোমাদের দশজনের কৃপায় কোন রকমে বেঁচে আছি আর কি! দুঃখীর পরাণ তো আর সহজে বেরোয় না!'

'প্রাণ বেরোলেই ভালো হয় বুঝি?' রহস্য ক'রে প্রশ্ন করেছিল রাজেন দত্ত।

'সে কথা আবার বলতে? প্রাণ বেরোলে তো দশ দুয়ারে ভিক্ষে মেগে ফিরতে হতো না।'

বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে পদ্মঠাকুমা। তারপর আঁচলে চোখ দুটিকে একবার মুছে, একবার খেঁকরি দিয়ে গলাটাকে একটু সাফ ক'রে নিয়ে বলে, 'তোমার সঙ্গে যে একটা কথা ছিল গো কবরেজমশাই। ভাবছিনু যাবো একবার তোমার ঠাঁই।'

'বেশ তো। যাস একদিন।' বলে রাজেন দত্ত আবার হাঁটতে আরম্ভ করল।

পদ্মঠাকুমা ডাকল, 'ও কবরেজমশাই, দাঁড়াওই না একটু বাপু, যাবে তো সেই সতীশঠাকুরের বাড়ী, তা এত তাড়া কেন?'

রাজেন দত্ত দাঁড়াল। একটু হাসল। বলল, 'আয় না, এই তো আমি দাঁড়িয়েছি।'

পদ্মঠাকুমা আবার তার লাঠি ঠুক ঠুক ক'রে রাজেন দত্তের কাছে গেল।

বেলা তখন পড়ন্ত। সারা গাঁয়ে গোধূলির ম্লান ছায়া নেমেছে। ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপের আয়োজন চলেছে। ক'টি ডাগর মেয়ে খিলখিল ক'রে হাসতে হাসতে জল নিয়ে গেল। একটি মেয়ে বড় চঞ্চল। হাসতে গিয়ে একেবারে

যেন গড়িয়ে পড়ে। তারই কাঁখের ভরা কলসী থেকে ছলাৎ ক'রে খানিকটা জল রাস্তায় পড়ল। কয়েকটি জলের ছিটে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে গেল। কয়েকটি এসে লাগল রাজেন দত্তের পায়। মেয়েটির মুখ যেন শুকিয়ে গেল। মনে হলো, কে যেন এক চুমুকে তার মুখের সবটুকু রক্তই খেয়ে নিল। সে মাথা নামিয়ে আবার তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

রাজেন দত্ত বলল, 'মেয়েটি কে হে পদ্ম, মুখের ছাঁচটি তো ভারি সুন্দর। গায়ের রঙটিও বোধ হয় ভালো।'

'ঐ তো, ঐ তো আমাদের গোলাপ। গোপাল ঠাকুরের মেয়ে।'

'গোপালের মেয়ে এতটা বড় হয়েছে?'

'তা হয়েছে বই কি। হাতে পায়ে বেড়ে উঠেছে। এই মাসেই তো ওর বিয়ে। কাজ ঠিক হয়ে গেছে। ধামরাই।'

'বেশ, ঘর-বর নিশ্চয়ই ভালো। মেয়েটির মুখে একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে।'

হঠাৎ যেন কি হলো পদ্মঠাকুমার। রাজেন দত্তের ডান হাতটা চেপে ধরে বলল, 'কবরেজমশাই, আমার একটা কথা রাখবে কবরেজমশাই?'

প্রথমটায় একটু বিস্মিতই হয়েছিল রাজেন দত্ত। পদ্মঠাকুমার এতটা বাড়াবাড়ি সে আশা করে নি। গাঁয়ের দুঃখী কাঙালী মানুষ। দশ দোরে চেয়ে-চিন্তে খায়। দুনিয়ায় তাকে দেখবার আর কেউ নেই। তাই রাজেন দত্ত তাকে মাঝে মাঝে দু'একটি টাকা দিয়ে সাহায্য করতো। ঐ পর্যন্তই। তা ছাড়া পদ্মঠাকুমার সঙ্গে রাজেন দত্তের আর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আজ অমন করছে কেন পদ্মঠাকুমা? রাস্তায় রাজেন দত্তের হাতখানা সে চেপে ধরল কেন? সে কি চায়? কী তার প্রত্যাশা?

রাজেন দত্তের বিস্ময়ের ঘোর না কাটতেই পদ্মঠাকুমা আবার আরম্ভ করল, 'কথা দাও, আমায় তুমি কথা দাও কবরেজমশাই, এ পদ্মবুড়ীর একটা অনুরোধ তুমি রাখবে। একটা সাধ তুমি পুরাবে। আহা, দুটিতে কত ভাব, দুটি জীবনের কত স্বপ্ন!'

বলতে বলতে পদ্মঠাকুমার দুটি চোখ টলটল ক'রে উঠল। চোখের কোণ দিয়ে ক' ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল।

তা দেখে হাসল রাজেন দত্ত। বলল, 'আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়লাম যা হোক। কথা নেই বার্তা নেই, পথে দাঁড়িয়ে হাউহাউ ক'রে কান্না জুড়ে দিল।'

'আমার নিজের দুঃখে আমি কাঁদি না কবরেজমশাই। আমি কাঁদি দুটি জীবনের কথা ভেবে।'

রাজেন দত্ত আবার তার বিস্মিত দুটি চোখ তুলে পদ্মঠাকুমার মুখের দিকে তাকাল।

পদ্মঠাকুমা বলল, 'গোপালঠাকুরের মেয়েকে তুমি অন্যের ঘরে যেতে দিয়ো না কবরেজমশাই।'

'মানে?'

রাজেন দত্তের চোখের বিস্ময় কেটেছে। আগুন-ধরা টিকার মতো যেন জ্বলে উঠেছে দুটি চোখের দুটি কালো তারা।

পদ্মঠাকুমা উত্তর করল, 'রসিক গোলাপকে ভালোবাসে—'

আগুনে যেন ঘৃতাহুতি হলো। রাজেন দত্ত দপ ক'রে জ্বলে উঠল। পদ্মঠাকুমার কথা শেষ না হতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কি? কি বললি? আর একবার বলতো! দেখি, আমি তোর জিবটা টেনে তুলে দিতে পারি কি না! তোর মুণ্ডটা—' উত্তেজনায় কথা বন্ধ হলো রাজেন দত্তের। তার সারা দেহ থরথর করে কেঁপে উঠল।

পদ্মঠাকুমা রাগল না। বরং মমতায় তার মুখখানি যেন আশ্চর্য রকম করুণ হয়ে এল। দুটি চোখের পাতা ছাপিয়ে তার চোখের জল উপচে পড়ল। বলল, 'কেন রাগ করছো কবরেজ, আজ হোক কাল হোক ছেলেকে তো তোমার বে' দিতেই হবে। ভীষ্মের মতো তাকে তো আর আইবুড়ো করে রাখবে না! তা হলে এ বে'-তে তোমার আপত্তি কেন? গোপালঠাকুর বাউন বলে? আরে আজকাল কি আর বাউন-কায়েত ফারাক আছে? এই না মধু সাহার ছেলে লক্ষ্মীকান্ত রাতারাতি বেহ্ম হয়ে চাটুজ্যেদের মেয়েকে বে' ক'রে এনেছে।'

'আমি কারও উদাহরণ পছন্দ করি না।' বলে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল রাজেন দত্ত। সে চীৎকার শুনে রায়েদের জানলায় এসে কারা যেন দাঁড়াল। সাহা বাড়ীর ছাদ থেকে ক'জোড়া চোখ পথের দিকে দৃষ্টি ফেলল।

পদ্মঠাকুমা বলল, 'এ কি কথা তুমি বলছো কবরেজ? দুটিতে মিলে এই যে স্বপ্ন দেখল, দুটিতে মিলে যে হৃদয় বিনিময় করল, তা কি ব্যর্থ হবে কবরেজ? একবারও তুমি দুটির মুখের দিকে চাইবে না?'

'না।'

'না ?' কম্পিত স্বর পদ্মঠাকুমার কণ্ঠে।

'তুই তো জানিস, আমি দু'বার কথা বলি না। দু'রকম কথা বলি না।'

'তা হলে ছুটিতে যে—'

পদ্মঠাকুমা কি বলতে গিয়েও যেন বলতে পারল না। হয়তো তার মুখে এল না।

রাজেন দত্ত সে ইঙ্গিত বুঝল। সে পদ্মঠাকুমার আরও একটু কাছে এল। তারপর বাঁ চোখটা অসম্ভব রকম ছোট ক'রে ডান চোখটাকে টেনে বাড়িয়ে সে বলল, 'বড়লোকের ছেলেরা ও এক-আধটু ক'রেই থাকে পদ্ম ; তোর নিজের কথাটাই একবার ভেবে দেখ না।' বলেই রাজেন দত্ত হনহন ক'রে হেঁটে চলে গেল।

পদ্মঠাকুমার মুখে কে যেন ছাই মাখিয়ে দিয়েছে। তার পা দুটি যেন শিথিল হয়ে এসেছে। সে নড়তে পাড়ছে না। সরতে পারছে না।

'আমায় ডাকছেন ?'

রসিকচন্দ্র ধীরে ধীরে এল বাবার কাছে। সারাদিন কোথায় ছিল কে জানে! আকাশে যত রোদ ছিল তার সবই যেন তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে। রোদে পুড়ে মুখটা যেন কালো হয়েছে। চোখ দুটি নিষ্প্রভ। চুলগুলি রুক্ষ। উস্কখুস্ক। বাবার কাছে এসে সে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজেন দত্তের আর উত্তেজনা নেই। এতক্ষণ যে ক্রোধ তার শিরায় শিরায় ছলছলিয়ে উঠেছিল, এখন যেন তা অনেকটা মিইয়ে এসেছে।

রাজেন দত্তের স্বভাবটাই এই। সোডার বোতল যেমন মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে খানিকক্ষণ গবগব ক'রে ঠাণ্ডা হয় রাজেন দত্তও তেমনি। ঝট ক'রে রেগেই আবার ফট ক'রে ঠাণ্ডা হয়। কাজেই যে উত্তেজনা নিয়ে সে পদ্মঠাকুমার কাছ থেকে চলে এসেছিল, এতক্ষণে সেটা পড়ে গিয়েছিল।

রসিকচন্দ্র আবার বলল, 'আমায় ডাকছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'বোস।' রাজেন দত্তের মুখ থেকে কথাটা হঠাৎ যেন ফসকে গেল। আরও কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না রাজেন দত্ত। একটা লজ্জা যেন তার গলাটাকে চেপে ধরল। তবুও বলল, 'বোস বলচি।'

ঘরজোড়া একটি তক্তপোষ। রসিকচন্দ্র তার এক কোণে বসল।

রাত হয়েছে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে যে অন্ধকার আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়েছিল, এখন আর তা নেই। অন্ধকার কেটেছে। চাঁদ উঠেছে। মেঘমুক্ত নীলাকাশ, যেন ঝলমলে একখানি নীল থালা। খোলা জানলা দিয়ে সেই আকাশের দিকেই তাকিয়েছিল রাজেন দত্ত। চাঁদটা মজুমদার চকের অশথ গাছটির ঠিক মাথার উপরে উঠেছে। বাতাসটা জোর। কোন্ ঝোপে-ঝাড়ে যেন বুনো জুঁই ফুটেছে। তারই গন্ধ আসছে। ভালোই লাগছে।

'রসে!'

রসিকচন্দ্র চোখ মেলে চাইল।

'এসব কি শুনচি রে রসে?'

'কি বাবা?'

'লোকে এ সব বলছে কি?'

রসিকচন্দ্র নিরুত্তর।

'ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, শেষ পর্যন্ত—'

'বাবা!'

রাজেন দত্ত এবার রসিকচন্দ্রের মুখের দিকে তাকাল। হারিকেনের ম্লান আলোতে দেখল, রসিকচন্দ্রের মুখমণ্ডল যেন অনেক ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সেখানকার সবটুকু রক্ত যেন নিঃশেষ হয়েছে। দু'চোখ ছলছল। কি একটা কথা যেন ঠোঁটের আগায় এসে থরথর ক'রে কাঁপছে।

রাজেন দত্ত বলল, 'শেষ পর্যন্ত একটা বামুনের মেয়েকে—'

'গোলাপকে আমি ভালোবাসি বাবা।'

'কি বললি? কি বললি তুই?' বলে তক্তপোষ থেকে লাফিয়ে উঠল রাজেন দত্ত। তার হাত লেগে হারিকেনটা দুলে উঠল। কয়েকবার দপ্ দপ ক'রে আলোটা নিবে গেল।

কিন্তু আজ আর ভয় পেল না রসিকচন্দ্র। একটু নড়ল না। বরং অবিকম্প কণ্ঠে আবার সে বলল, 'গোলাপকে আমি—'

'চুপ! চুপ! ও কথা মুখে আনবি তো তোর জিব ছিঁড়ে ফেলব।'

'না।'

'মানে?'

'তুমি তা পারো না?'

এবারে হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল রাজেন দত্ত। এতক্ষণ ঘরময় দ্রুত পায়চারি করছিল, হঠাৎ থপ ক'রে সে থেমে গেল। থেমেই চীৎকার ক'রে এগিয়ে এল রসিকচন্দ্রের দিকে। বলল, 'কি বললি? কি বললি? আমি পারি না? আমি পারি না? বেরো, বেরো হারামজাদা, আমার বাড়ী থেকে এক্ষুনি বেরো। এ জীবনে আমি আর তোর মুখ দেখতে চাইনে।'

চীৎকার শুনে সরযুবালাও দৌড়ে এসেছিল। কিন্তু রসিকচন্দ্র তার দিকে না তাকিয়েই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সরযুবালা ডাকল, 'রসে! রসে!'

রসিকচন্দ্র কোন উত্তর দিল না।

সরযুবালা আবার ডাকল, 'রসিক! রসিক!'

এবারও রসিকচন্দ্রের কোন উত্তর পাওয়া গেল না। কিন্তু এগিয়ে এল রাজেন দত্ত। হঠাৎ চীৎকার ক'রেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে সে। চোখদুটি তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে জ্বলছে। ম্লান চাঁদের আলোতে তাকে হঠাৎ দেখলে পাথরের মূর্তি বলেই মনে হয়। সরযুবালার কাছে এসে সে বলল, 'কুপুত্র বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো সরযু, ওকে যেতে দাও। মনে করো আমাদের কোন ছেলে হয় নি। আমাদের কোন ছেলে ছিল না।'

কথা ক'টি বলতে বলতে বোধ হয় ক'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল রাজেন দত্তের চোখ থেকে। সে তা লুকোবার উদ্দেশ্যেই হয়তো বৈঠকখানায় চলল। বজ্রাহতের মতো থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সরযুবালা। তার মুখে কথা নেই। চোখে জল নেই। চোখের উপর দিয়ে কি ঘটে গেল হঠাৎ যেন সে তা বুঝতেও পারল না।

দশ

ঘর থেকে বেরিয়েই সোজা নদীর ধারে গেল রসিকচন্দ্র। বর্ষার ধলেশ্বরী কানায় কানায় ভরে উঠেছে। ওপারের নমঃ পাড়ার বাড়ীগুলি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি দ্বীপ। চারদিকে ছলছল করছে বর্ষার জল। তার উপর এক একটি টিলার মাথায় এক একটি বাড়ী। ধলেশ্বরীর ঢেউএ ঢেউএ যেন দুলছে। বাজারপাড়ার বিশাল বটগাছটির গুঁড়িতে বসে রসিকচন্দ্র অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল। ওপারের আনন্দ গায়েনের বাড়ী থেকে একটা গানের স্বর ভেঙে ভেঙে এপারে উড়ে আসছে। কালিয়াপুর ধামরাই প্রভৃতি জায়গার গয়না নৌকাগুলি 'ঢাকা···ঢা···কা···আ···আ···আ···' বলে হাঁক দিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। রসিকচন্দ্র ভাবল, 'না, না, আর সোনাক্ষেতে থাকবে না সে। থাকতে পারবে না। চলে যাবে যে দিকে দু'চোখ যায়। কতলোকের তো ঘর নেই, বাড়ী নেই, বন্ধু নেই, আত্মীয়স্বজন নেই, তারা কি মানুষ হয় না? তারা কি বড় হয় না? এই তো সোনাক্ষেতেরই বৈকুণ্ঠ সাহা পালিয়েছিল দশ বছর বয়সে। বাড়ী থেকে পালিয়ে মিরকাদিম গিয়েছিল। মিরকাদিমে ঢুকেছিল এক বড় মহাজনের তহবিলে। প্রথমে তামাক ভরার চাকরি। ফাই-ফরমাস শোনার চাকরি। সেই থেকেই তো সে এত বড়। এতগুলি কারবারের মালিক! এ সব কথা তো সে নিজে শুনেছে বৈকুণ্ঠ সাহার মুখ থেকে। সে যদি এখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে, তাহলে কি আর কিছু একটা করতে পারবে না? পারবে, পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। বৈকুণ্ঠ সাহা যদি পেরে থাকে তাহলে সে-ও পারবে।'

একটা বিরাট আশায় রসিকচন্দ্রের বুক ভরে ওঠে। আর যদি তা না-ও পারে তাতেই বা ক্ষতি কি? সে তো আর বে-সাদী করবে না, সংসার-গৃহস্থালী করবে না, তবে আর অত ভাবনা কেন? থাকার মধ্যে একটা তো মাত্র পেট। সেটা কোন মতে চলে যাবে। দুঃখী-কাঙালীরও তো দিন কাটে। তার দিন কি আর কাটবে না?

কিন্তু মার কথা ভেবে, গোলাপের কথা ভেবে দু'চোখ ভরে তার জল

আসে। হায় রে, এ জনমে বুঝি আর তাদের সঙ্গে দেখা হবে না! মা কাঁদবে, দুয়ারে পড়ে আছাড়-পিছাড় খাবে। প্রথম প্রথম গোলাপও কাঁদবে। কাঁদবে না? গোলাপ যে তাকে ভালোবাসে। অন্যের সঙ্গে বিয়ে হলেই কি ভালোবাসার মানুষকে সহজে ভোলা যায়? যায় না। গোলাপও তাকে ভুলতে পারবে না। সোনাক্ষেতের লোকজন ওর শ্বশুরবাড়ীর ঘাটে নাও বেঁধে যখন ধামরাইএর রথে যাবে, তখন গোলাপ ওর শ্বশুরবাড়ীর জানালায় দাঁড়িয়ে একটি মুখ দেখবার আশায় ব্যাকুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

সে মুখ যে কার, রসিকচন্দ্রের সেটা অজানা নয়।

কথাটা ভেবে রসিকচন্দ্রের মনের ব্যথা যেন আরও বেড়ে গেল। চোখের জল যেন আরও দ্রুত নামল। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে গেল। রাত, কত হলো?

এরই মধ্যে যে হাটুরেরা হাট থেকে ফিরে এসেছে। পানের ব্যাপারী নিতাই, বুদ্ধু, গুড়ের কারবারী শিবু, বিশু, ঘেতু সাহা—সব—সব এসে গঙ্গাচরণ মাষ্টারের ঘাটে নামল। না, এবারে উঠতে হয়। একা একা আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়? মনটা এমনিতেই খারাপ। একলা থাকলে আরও খারাপ লাগে। এবারে অন্য কোথাও যেতে হয়।

উঠল রসিকচন্দ্র।

উঠে সে কবরেজ পাড়ার পথে গেল না। গেল গোপাল আখড়া ডাইনে রেখে 'বাপু' রাখালের বাড়ীর পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি সতীশ ঠাকুরের বাড়ীর কাছে গিয়ে উঠেছে, সে-ই রাস্তা দিয়ে। রাস্তাটি ভালো নয়। একে তো অপরিষ্কার, উঁচু-নীচু, তাতে আবার এ রাস্তা সম্পর্কে নানাজনে নানা কথা বলে। কাজেই একান্ত না ঠেকলে এ রাস্তায় কেউ পথ চলে না। রসিকচন্দ্রের সেইটেই বড় ভরসা। সে সেই পথ দিয়েই পদ্মঠাকুমার দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াল।

পদ্মঠাকুমা ঘুমায় নি। দাওয়ায় একখানি মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছিল। গরমের দিন। এদিনে ঠাকুমা ঘরে শোয় না। দরজায় তালা লাগিয়ে সে দরজার সামনেই পড়ে থাকে। আজও ছিল। রসিকচন্দ্রের পায়ের শব্দে চমকে উঠল। বলল, 'কে?'

'আমি, আমি গো ঠাকুমা।' বলে রসিকচন্দ্র তার কাছে গেল।

এবারে উঠে বসল পদ্মঠাকুমা। কুপিটা জ্বালাল। তারপর হেসে বলল, 'কে নাগর? তা আবার রাগ করা হয়েছে ক্যানে?'

রসিকচন্দ্র কিছুই বুঝতে পারল না। কেবল ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল পদ্মঠাকুমার মুখের দিকে।

পদ্মঠাকুমা আবার হাসল। বলল, 'এ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে এর মধ্যেই তল্লাসী হয়ে গেছে। অনাথ এইছিল।'

রসিকচন্দ্র এবারে বুঝল ব্যাপারটা। বলল, 'তা আসুক।'

'সে কি কথা গো?'

'বাড়ীতে তো আর আমার ঠাঁই নেই ঠাকুমা।'

'কে বললে?'

'বাবা।'

'ওঃ' বলে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল পদ্মঠাকুমা। কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'ও তো তাঁর মনের কথা নয় নাগর, ও হলো তাঁর মুখের কথা। এসো, বসো। সে কথা পরে হবে।' বলে পদ্মঠাকুমা তাকে হাত ধরে কাছে বসাল। তারপর খানিকক্ষণ রসিকচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ও মা! এ কি ছিরি হয়েছে গো! মুখের দিকে যে চাওয়া যায় না! সারা দিন পেটে কিছু পড়ে নি নাকি?'

রসিকচন্দ্র কোন কথা কইল না।

পদ্মঠাকুমা একেবারে যেন হাউহাউ ক'রে উঠল। বলল, 'এ সব হচ্ছে কি? বলি, এ সব হচ্ছে কি? এমনি না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে দেহটাকে কি নষ্ট করবে?'

রসিকচন্দ্র মাথা নীচু ক'রে রইল।

পদ্মঠাকুমা বলল, 'যাও, বালতিতে জল আছে, হাত মুখ ধুয়ে এসো। এত রাত্তিরে আর কি জুটবে? ক'টি মুড়ি দিই, বসে বসে তাই চিবোও।'

রসিকচন্দ্র তাতেও উঠছে না দেখে, পদ্মঠাকুমা নিজেই তাকে ঠেলে উঠিয়ে দিল।

সে রাতে আর কোথাও গেল না রসিকচন্দ্র। পদ্মঠাকুমাও তাকে বাড়ী ফিরতে বলল না। সে পদ্মঠাকুমার বিছানায়ই পড়ে রইল।

রাত বাড়ল। চাঁদটা পুবের আকাশে গড়িয়ে গড়িয়ে মাথার উপরে উঠল। সোনাক্ষেত নিঃস্তব্জ হলো। ঝোপে-ঝাড়ে ঝিঁঝি ডাকল।

রসিকচন্দ্রের চোখে ঘুম আসছে না। সে এপাশ ওপাশ করছে। চোখের জলে বালিশ ভিজছে। ফুলে ফুলে, ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে উঠছে রসিকচন্দ্র।

পদ্মঠাকুমা ডাকল, 'নাগর!'

রসিকচন্দ্র মুখ ফিরিয়ে নিল।

'ঘুম আসছে না, নয়?'

রসিকচন্দ্র তবুও কথা কইল না।

পদ্মঠাকুমা বলল, 'হয় হে, অমনি হয়। মনের মানুষ দূরে থাকলে অমনি হয়। মনটা ক্যামুন যেন আইঢাই করে। ক্যামুন যেন জ্বলে জ্বলে যায়।'

জ্যৈষ্ঠ মাস। আমে পাক ধরেছে। দু'একটা আম টুপ্‌টাপ পড়ছে। মজুমদার চকে দু' একটা শিয়াল মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে।

পদ্মঠাকুমা আবার বলল, 'ভালোবাসার এইতো ছল, নাগর। ক্ষেনে হাসি, ক্ষেনে জল।'

'ঠাকুমা!'

'বলো।'

'তুমি পুনর্জন্ম মানো ঠাকুমা?'

'হঠাৎ এ কথা কেন?'

'না, ঐ যে, কি যেন একখানা গান গাও তুমি। কি যেন তার কথা: কি আর বলব.........'

পদ্মঠাকুমা হাসে। হেসে হেসেই গানে টান দেয়।

'বঁধু কি আর বলিব আমি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইয়ো তুমি।'

গান শেষ হলে বলল, 'হঠাৎ এ গানের কথা মনে পড়ল যে?'

'জানি নে।' রসিকচন্দ্রের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে গেল।

পদ্মঠাকুমা আবার হাসল। বলল, 'আমি কিন্তু জানি।'

'জানো তো বলো।'

'বলবো?'

'জানো তো বলো না।'

পদ্মঠাকুমা একটু থামল। কয়েকবার কেশে গলাটাকে বুঝি ঠিক ক'রে নিল। কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'না, সে কথা থাক।'

রসিকচন্দ্র আর কথা বলল না। পদ্মঠাকুমাও চুপ করল। বাইরের জ্যোছনা আম পাতার ফাঁক দিয়ে উঠোনে পড়ে ঝিকমিক করছে।

পদ্মঠাকুমা ঘুমিয়ে পড়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মুখে তার একটা শব্দ হচ্ছে। ফক্‌ফক্‌ কেমন একটা বিশ্রী শব্দ। পদ্মঠাকুমার দাঁত নেই বলেই মুখে তার এমন শব্দ হয়। রসিকচন্দ্র একবার তাকিয়ে দেখল পদ্ম-ঠাকুমাকে। হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছে পদ্মঠাকুমা। তার দুটি গাল যেন তুবড়ে মুখের ভেতর ঢুকে গেছে। দুটি নিষ্প্রভ ঠোঁট একবার খুলছে, একবার লাগছে। বড় একলা মনে হলো রসিকচন্দ্রের। এই জ্যোছনা রাতের অসীম নির্জনতায় সে যেন কেমন অসহায় ভাবল নিজেকে। না, তার নিজের বলতে এ দুনিয়ায় কেউ নেই। মা, বাবা কেউ তার আপনার নয়। নইলে তারা কি এমনিভাবে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারত? পারত কি তার কচি কোমল মনটাকে এমনিভাবে দলে পিষে মারতে? বিয়ে তো তাকে একদিন করতেই হতো। সেটা দু'দিন বাদে না হয়ে যদি এখনই হয় তাতে ক্ষতি কি? আর হয় যদি তারই কোন ভালোবাসার মেয়ের সঙ্গে সেটাই বা তেমন অন্যায় কাজ কিসের? না, আর থাকবে না, সোনাক্ষেতে আর থাকবে না রসিকচন্দ্র। সোনাক্ষেতের প্রতি আর তার আকর্ষণ নেই। মজুমদারের চক, ধলেশ্বরী নদীর কথা মাঝে মাঝে তার মনে পড়বে। পড়ুক। জীবনের খাতায় কত রেখাই তো পড়ে। সব রেখাকেই কি আর মুছে ফেলা যায়? না, মুছে ফেলা সম্ভব? ধলেশ্বরী নদী, মজুমদারের চক, ফকির বাড়ীর গাথার কথা তার মনে চিরদিন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। অনেক কাজ না থাকা সন্ধ্যায়, অনেক ঘুম ভেঙে যাওয়া রাতে এদের কথা ভেবে দু'চোখ ভরে তার জল আসবে। আসুক। সে জল আবার মুছে ফেলবে রসিকচন্দ্র। আবার সে নতুন দেশের সঙ্গে ভালোবাসা করবে। নতুন নদীর সঙ্গে পরিচয় করবে।

ভাবতে ভাবতে রসিকচন্দ্রের দু'চোখ ভরে জল এল। হায় রে, কেউ বুঝল না তার মনের কথাটা! মনের ব্যথাটা! মা না, বাপ না, কেউ না! সবাই তাকে ভুল বুঝল।

রসিকচন্দ্রের কান্না যেন আরও বেড়ে গেল।

চাঁদ অনেকটা পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। পদ্মঠাকুমার উঠোন থেকে চাঁদকে

আর দেখা যায় না। পুব আকাশে, মজুমদার চকের অশ্বত্থ গাছটির মাথায় ঝকঝকে একটা তারা উঠেছে। ভোর-তারা। দখনে হাওয়ায় একটা টগর ফুলের ঘ্রাণ আসছে। ওপাশের পেয়ারা গাছটার মাথায় ক'টি শালিক বাসা বেঁধেছিল। এবারে তারা নড়ে চড়ে উঠল। রাত আর বেশী নেই।

'রাত আর বেশী নেই।'

রসিকচন্দ্র মনে মনে উচ্চারণ করল কথাটা। যেতে হলে এখনই যে যেতে হয়। সোনাক্ষেত ছাড়তে হলে এই তো তার সুসময়। একটু বিলম্ব হলেই লোকজন উঠে পড়বে। ও বাড়ীর সদিবোন খুব ভোরে 'ছড়া' দেয়। এতক্ষণ সে-ও বোধ-হয় উঠি উঠি করছে। তাদের বাড়ীর কাছ দিয়েই যে রসিকচন্দ্রকে যেতে হবে। সদিবোন একবার দেখে ফেললে কি আর তার যাওয়া হবে? হাউহাউ ক'রে সারাটা পাড়া জাগিয়ে তুলবে না সে? না, আর না। এবারে উঠি।

উঠল রসিকচন্দ্র। পদ্মঠাকুমার মুখের দিকে একবার চাইল। পদ্ম-ঠাকুমা ঘুমে ডুবে আছে। মুখ দিয়ে সেই ফক্‌ফক্‌ একটা আওয়াজ হচ্ছে। 'যাই, যাইগো ঠাকুমা, এ জীবনে হয়তো আর দেখা হবে না।'

মনে মনে কথা ক'টি বলতে গিয়েও দু'চোখ ভরে জল এল রসিকচন্দ্রের। হাত দিয়ে মুছে নিল। তারপর পা বাড়াল মজুমদার চকের দিকে। মজুমদার চকের ওধারে ব্রহ্মচারীর মাঠ। সেই মাঠের পাশ দিয়েই বিরুলিয়ার রাস্তা গেছে। প্রথমটায় বিরুলিয়া যাবে রসিকচন্দ্র। বিরুলিয়ায় তার মাসীর বাড়ী।

এগার

কাজ ঠিক হয়েছে। সামনেই বিয়ের দিন। সাতাশে আষাঢ় বুধবার। হাতে তো মাত্র ক'টা দিন। এরই মধ্যে সব ব্যবস্থা করতে হবে। কথায় বলে বিয়ের কাজ, শত ঝঞ্ঝাট না হলে বিয়ের কাজ সমাধা হয় না। তার উপর কন্যাপক্ষের 'ট্যাঁকের' জোর যদি কম থাকে, তা হলে তো কথাই নেই। বাড়ীর কর্তাকে তখন নাকের জলে-চোখের জলে একখান হতে হয়। গোপাল চক্রবর্তীরও হয়েছে সেই অবস্থা!

অবশ্যি বরপক্ষ কোন বিষয়েই চাপ দেয় নি। দেনা-পাওনার কথা উঠতেই শ্রীহরি চক্রবর্তী বলেছে, 'আরে রাখুন, রাখুন ওসব কথা। যেখানে চিরকালের কুটুম্বিতা হলো, সেখানে ওসব নিয়ে আর টানাটানি কেন? দেবেন, আপনার মেয়েকে আপনি সাজিয়ে দেবেন। সে আপনি দু'ভরি দিয়েই সারুন আর দশ ভরিতেই সারুন, সে ব্যাপারে আমি কিছুই বলবো না।'

গোপাল চক্রবর্তী বলেছিল, 'সে কি আর একটা কথা হলো বেহাই মশাই।'

'কেন? কথা হবে না কেন? ছেলে বে' করিয়ে মেয়ে নেবো। ছেলেকে তো আর 'সোনা' বে' করিয়ে নেবো না?'

'তবুও তো'—আবার কথা বলতে গিয়েছিল গোপাল চক্রবর্তী। কিন্তু পারে নি। শ্রীহরি চক্রবর্তী বাধা দিয়েছিল। হুঁকো থেকে মুখটা উঠিয়ে বলেছিল, 'আর তবু নয় বেহাই, জীবনে অনেক টাকা কামিয়েছি, অনেক টাকা ব্যয়ও করেছি। আপনার কাছ থেকে ক'ভরি সোনা টেনে না নিলেও আমার বৌমা'র গা খালি থাকবে না।'

নিজের ছেলে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল শ্রীহরি চক্রবর্তী। এ মাল যে বাজারে কি দরে বিকোয় কারবারী শ্রীহরি চক্রবর্তীর সে কথাটা অজানা ছিল না। তাই গোপাল চক্রবর্তীর কাছে কোন দাবি রাখে নি সে। দেনা-পাওনার কথা তুলতেও সম্মত হয় নি। গোপাল চক্রবর্তীর কথায় অত্যন্ত সহজভাবেই সে বলেছিল, আপনি পাঁজি আনুন, বিয়ের দিন ঠিক করুন। মনে হলে শুধু পান-সুপুরি দিয়ে আপনি আপনার কন্যা সম্প্রদান করবেন।'

শুধু বললেই তো আর হলো না, একটি মাত্র মেয়েই তো ঐ গোলাপ, তাকে কি শুধু হাতে বিদেয় করতে পারে গোপাল চক্রবর্তী? পারে না। এই পারে না বলেই তাকে এখানে-ওখানে ছুটতে হয়। দশ জায়গায় হাত পাততে হয়। একটা মুহূর্ত তার অবসর নেই।

সেদিন একটু তাড়াতাড়িই বাজারে চলেছিল গোপাল চক্রবর্তী।

সবে সকাল হয়েছে। সরকার বাড়ীর বড় আমগাছটার পেছনে সূর্য তখন উঠি উঠি করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ফুলের সাজি হাতে নিয়ে ফুল তুলতে বেরিয়েছে। মতির মা একটা গোবরের টুকরি নিয়ে বাড়ী ফিরছিল। গোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হতেই সে থামল। বলল, 'এই, এই যে ঠাকুরভাই। এ্যাতো সক্কালে হনহন ক'রে কোথায় ছুটছো?'

গোলাপ চক্রবর্তী থামল। মতির মা এগিয়ে আসতেই বলল; 'যাক ভালোই হলো পথে দেখা হয়ে। আমি একলা মানুষ, কখন সময় পাই না পাই, তাই কিছু যদি মনে না করো দিদি, তা'লে কাজটা এখানেই সেরে ফেলি।'

মতির মা ইঙ্গিত বুঝল। হাসল। বলল, 'সে জন্যে কি! সে জন্যে কি! আমাদের আবার বলতে হবে কেন? তুমি বল আর না-ই বলো ঠাকুরভাই, গোলাপের বিয়েতে আমরা সক্কলে যাব। সাধ-আহ্লাদ করবো। পেট পুরে খাবো। ওর মুখে-প্রসাদে যে ফাঁকিটা আমাদের দিয়েছো, ওর বিয়েতে তার শোধ তুলবো না?'

'আচ্ছা, বেশ, বেশ। তা তুলবে বই কি! তা তুলবে বই কি!' বলে গোপাল চক্রবর্তী আবার চলতে আরম্ভ করেছিল।

মতির মা বলল, 'ওমা, একটু দাঁড়াও নাগো। এরই মধ্যে যাবে কোথায়? দোকানপাট কি আর এরই মধ্যে খুলেছে?'

'না, বড় তাড়া দিদি।'

'তা তাড়া থাকবে বই কি! একটা মেয়েকে কাঁধ থেকে নামানোর ধকল কি আর কম? সেটা আমরা বুঝি।' বলতে বলতে মতির মা হাতের টুকরিটা মাটিতে নামাল। তারপর এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখে আস্তে আস্তে বলল, 'তা আচ্ছা জব্দটা করলে গো ঠাকুরভাই! কায়েতের পো চায় কিনা বামুনের মেয়েকে ঘরে নিতে। দু'টো পয়সার মুখ দেখেছে বলে বাছাধনেরা যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।'

গোপাল চক্রবর্তী যেন কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল মতির মার মুখের দিকে।

মতির মা সোল্লাসে বলল, 'ঐ যে রাজু দত্তের পুতগো—রসে, তুমি কি মনে করো এ সব ঐ বয়াটে ছোঁড়ার কাজ? নাগো না, অত সাদা মন রাখলে আজকাল আর বাস্তবি করা চলে না ঠাকুরভাই। দিনটাই যখন প্যাঁচের, তখন মনটাকেও একটু বাঁকা ক'রে রাখতে হয়। আমি তোমায় হলপ ক'রে বলতে পারি, এ সকল কেলেঙ্কারীর মূলে হলো ঐ রাজু কবরেজ। ছেলেকে বামুনের মেয়ের পিছনে লেলিয়ে দিয়ে নিজে কুলীন বনতে চেয়েছিল।'

গোপাল চক্রবর্তীর দুটি চোখ হঠাৎ যেন লাল হয়ে উঠল। কান দুটিতে কেমন যেন একটা গরম গরম ভাব। মাথা থেকে হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ শিহরণ উঠে পা পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। মতির মা তার মুখমণ্ডলের দিকে একবার ভালো ক'রে তাকিয়ে নিয়ে আরও একটু কাছে এসে বলল, 'আর যেমন কম্মো তেমনি ফল! বাপ বেটায় ইতিমধ্যেই লেগে গেছে। এই না সোহাগের পুতকে কাল বাড়ী থেকে তাগিড় করেছে।'

সংবাদটির গুরুত্বে এবার যেন উৎসাহ প্রকাশ করল গোপাল চক্রবর্তী। বলল, 'তাগিড় করেছে?'

একটা পাতলা হাসি খেলে গেল মতির মা'র মুখমণ্ডলে। তার দুটি চোখের পাতা হঠাৎ কুঁচকে গিয়ে অনেকটা যেন ছোট হয়ে এল। পিঠের ছড়ানো আঁচলটা টেনে আরও একটু আঁটসাঁট ক'রে কোমরে গুঁজতে গুঁজতে বলল, 'করবে না? এখনও যে মাথার উপর ভগবান আছেন। এখনও যে দিন-রাত্তির হয়। গঙ্গায় জোয়ার-ভাঁটা খেলে। উঃ, সেদিন আমায় কি অপমান! রাজু দত্ত নিজের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আমার সাত পুরুষের ছেরাদ্দ করলে গা। আমি নাকি ওর পোলার চরিত্তির নিয়ে কোথায় কি বলেছি! ধসে পড়বে—ধসে পড়বে, যে পয়সার গরমে রাজু দত্ত মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না, সে পয়সা ওর উড়ে যাবে।'

বলতে বলতে মতির মার দু'চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। হাতের পিঠ দিয়ে তা মুছতে মুছতে বলল, 'আচ্ছা, তুমিই বলো না ঠাকুরভাই, আমি কারো সাতে যাই, না পাঁচে থাকি? রাজু দত্তের ভালোয় মন্দয় আমার কি যায় আসে বাপু? সেই রাজু দত্ত কিনা—'বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল মতির মা। একটা চাপা কান্নায় গলাটা তার ধরে এল।

গোপাল চক্রবর্তী বলল, 'না, না, ওসব নিয়ে মন খারাপ করো না দিদি, এক জায়গায় থাকতে গেলে ও রকম এক-আধটু ভুল বুঝাবুঝি হয়েই থাকে।'

মতির মা আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'একটু ? এর নাম এক-আধটু ভুল বুঝাবুঝি ? বাড়ী ডেকে নিয়ে আমায় এমনি অপমান করলে গা ! সব্বোনাশ হবে—বাসি হাত বাসি মুখে বলি, সব্বোনাশ হবে।' বলে মতির মা পুব আকাশের উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় ক'রে আরও কত কি যেন বলল। সুযোগ বুঝে গোপাল চক্রবর্তী নিজের পথে পা বাড়াল। মতির মা বোধ হয় তা লক্ষ্যও করল না।

রসিকচন্দ্রের গৃহত্যাগের কথা গোলাপেরও কানে গেল। কানে গেল বিকেলে। ক'দিন ধরে মনের অবস্থা খুবই খারাপ। ক'দিন ধরে এক রকম ঘরের বারই হয় না বেচারা। শুধু মাঝে মাঝে মায়ের দু'একটা ফাই-ফরমাস যা খাটতে হয়। তাছাড়া সারাদিন সে প্রায়ই বিছানায় পড়ে থাকে। গোপাল চক্রবর্তীকে সব সময়েই ছুটোছুটি করতে হয়। কাজেই সে কিছুই টের পায় না। কিন্তু টের পায় কামিনীসুন্দরী। টের পেয়ে মনটা তার খচ ক'রে ওঠে। মনে যেন কিসের একটা কাঁটা বেঁধে। সে গোলাপের বান্ধবীদের কাছে খবর পাঠায়। নিজে যায়।

'ও মা, ও রেণু ? এ তোদের কেমন ধারা মা ? শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছিস তো আজ তিন তিনটে দিন হলো, এর মধ্যে একটি বার গিয়ে 'ফুচি'ও মারলি নে ? আমার গোলাপকে কি তোরা এরই মধ্যে ভুলে গেলি ?'

রেণু মানে রেণুবালা লজ্জায় মরে যায়। বলে, 'না, না। ভুলবো কেনে গো খুড়ীমা ! ছোটবেলার খেলার সাথী, তাকে কি ভোলা যায় ? না পর করা যায় ?'

'তবে ?'

খানিকটা সাদার গুঁড়ো দাঁতে ঠেলতে ঠেলতে প্রশ্ন করে কামিনীসুন্দরী। নিজ হাতেই একখানা কাঠের পিঁড়ি টেনে দাওয়ায় বসে।

রেণুবালা বলে, 'এক্কেবারে সময় করতে পারি নি খুড়ীমা। পিসিমা গেছে তার মেয়ের বাড়ী। মা শুধু একা। সংসারের কাজ তো আর কম নয়। মা একা পেরে উঠবে কেন ? তাই মার সঙ্গে আমাকেও হাত লাগাতে হয়।'

কামিনীসুন্দরী ঠোঁট দুটি ছড়িয়ে, চোখ দুটি অনেকটা বিস্ফারিত ক'রে

বলে, 'আরে, সোহাগীর ঝির কথা শোন, রান্ধে মেয়ে আর চুল বান্ধে না? সংসারের কাজ করতে হয় বলে কি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কটা চুকিয়ে ফেলতে হবে? আমি কিন্তু এসব কথার মানে বুঝি না বাছা।'

কামিনীসুন্দরী আরও খানিকটা—সাদার গুঁড়ো আঙুলের ডগায় উঠিয়ে মুখের ভিতর ঠেলে দেয়।

রেণুবালা তার কাছ ঘেঁষে বসে। কামিনীসুন্দরীর চাটাই পেড়ে শাড়ীর আঁচলটা দেখতে দেখতে বলে, 'তা তুমি মিথ্যে বলো নি খুড়ী, মনে হলে কি আর না যেয়ে পারতাম? আসলে আজকাল আমি বড় 'কুঁড়ে হয়ে গেছি। কোথাও যেন আর পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না।'

এবার রেণুবালার সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে দেখে কামিনীসুন্দরী। রেণুবালার সর্বাঙ্গে যেন কচিপাতার রঙ লেগেছে। দেহের আটঘাট কানায় কানায় ভরে উঠেছে। দুটি চোখের দৃষ্টিতেও যেন একটা সলজ্জ পুলকের ছাপ।

কামিনীসুন্দরীর হাবভাব বুঝে খুবই লজ্জা পায় রেণুবালা। বুকের আঁচলটা সে আরও একটু ছড়িয়ে দেয়। সারাটা মুখ সিঁদুর রাঙা। দুটি কান যেন ঝাঁঝাঁ করছে।

এবারে হেসে ফেলে কামিনীসুন্দরী। রোদের চুমো খেয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘের আড়াল থেকেও আকাশটা যেমন ক'রে হেসে ওঠে, কি একটা সম্ভাব্য সংবাদের প্রত্যাশায় কামিনীসুন্দরীর মুখমণ্ডলের রঙটাও যেন হঠাৎ তেমনি বদলে যায়। বলে, 'তোর মা কোথায় রে রেণু? এমন একটা শুভ সংবাদকে কি হাঁড়ি চাপা দিয়ে রাখতে হয়।'

রেণুবালা কথা কয় না। কামিনীসুন্দরীর মুখের দিকে একটা কটাক্ষ ছুঁড়ে হেসে সে দৌড়ে পালায়।

কামিনীসুন্দরী ডাকে, 'রেণু ও রেণু। শোন্ শোন্······

রেণুবালা দূর থেকেই উত্তর করে, 'বাকীটুকু তোমার বাড়ী গিয়েই শুনবো খুড়ী, এখন হাতে আমার অনেক কাজ।'

রেণুবালার কথায় রাগ করে না কামিনীসুন্দরী। সে জানে, প্রথমবার 'চান' থাকলে এমনই হয় মেয়েদের। এমন কৌতূহলী মন, এমন একটা সলজ্জতার ভাব। তখন রক্তে যেন হঠাৎ খুশীর ঢেউ লাগে। সে ঢেউএ মন রাঙায়। মন মাতায়। তখন সে বসতে গিয়ে হাসে, কথা বলতে গিয়ে হাসে। ঘুমোতে গিয়ে কেমন একটা অজানা পুলকে সারাটা শরীর যেন শির্-

শিরৃ ক'রে ওঠে। এ সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করতে গেলে সে লজ্জা পায়। লজ্জা পেয়ে ছুটে পালায়। এই ছুটে পালানোর মধ্যেই আবার নতুন আনন্দ।

কামিনীসুন্দরী বলে, 'শুধু শুনলে হবে না বাছা, দিদিকে বলিস্, একদিন— আমাদের সকলকে মিষ্টি মুখ করাতে হবে। আর খপরটা কেন এ্যাদ্দিন চেপে রাখা হয়েছে, সে জন্যে আমরা তার করবো নতুন জরিমানা।' বলে কামিনীসুন্দরী হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ায়। উঠতে গিয়েই মনটা তার কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। রেণুবালা আর গোলাপ সমবয়সী। রেণুবালা আজ ফলন্ত। আর গোলাপ?

কামিনীসুন্দরী যেন হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না।

রেণুবালা গোলাপদের বাড়ী গেল বিকেলে। রোদ তখন পড়ো পড়ো। একটা শিরৃশিরে দখনে বাতাস বইছে। সারাদিন অসহ্য উত্তাপে সোনাক্ষেত যেন পুড়ে মরছিল। এখন অনেকটা স্বস্তির শ্বাস ফেলছে। কামিনীসুন্দরী পাড়ার ক'জন মহিলার সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করছিল। রেণুবালাকে দেখেই যেন কলকলিয়ে উঠল, 'এই যে রেণু, তা হলে সত্যি এয়েছিস্?'

সকাল বেলার লজ্জা এখনও যেন রেণুবালার মুখ থেকে মোছে নি। কামিনীসুন্দরীর কথায় তার লাল কপোল দুটি আরও যেন লাল হয়ে উঠল। বলল, 'ও কি কথা বলচো গো খুড়ী, আসবো না কেন? গোলাপের বে', আর আমি আসবো না?'

'কি জানি বাছা, সেটা তোরাই জানিস্। তোদের ভাবগতিক দেখে কিছুতেই যে আমি ভরসা করতে পারছি নে।' বলে কামিনীসুন্দরী একটু হাসল। তারপর ইঙ্গিতে গোলাপের ঘরটি দেখিয়ে দিয়ে সে আবার উপস্থিত মহিলাদের সঙ্গে পরামর্শ শুরু করল।

শুয়েছিল গোলাপ। কামিনীসুন্দরী ইতিপূর্বে কয়েকবারই ডেকে গেছে তাকে। গোলাপ ওঠে নি। উঠি উঠি বলেছে। কিন্তু কামিনীসুন্দরী চলে যেতেই তার ওঠার উদ্যমও চলে গেছে। বরং মুখটা বালিশের মধ্যে ডুবিয়ে বুকটা পাটিতে ঠেকিয়ে সে যেন আরও ভালো ক'রে শুয়েছে।

এ ঘরের জানালার বাইরে একটা বড় আমগাছ। এ গাছের আম পাকলেও রঙ বদলায় না। ঘন সবুজ রঙ সবুজই থাকে। বাড়ীর লোক,

শুধু বাড়ীর লোক নয়, পাড়ার লোকও তাই গাছটিকে বলে 'কাইলা', মানে কালো আমের গাছ। সেই আমের ডালে হুটো কাক এসে জড়াজড়ি করে। হলুদ ঝুটি কি একটা পাখী পাকা আমে ঠোঁট লাগায়। হু'একটা পাকা আম টুপটাপ ক'রে পড়ে। গোলাপ শুয়ে শুয়েই সব দেখে। দেখে আর ভাবে। ভাবতে গিয়ে তার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে যায়। ক্রমে সূর্য পশ্চিমে গড়ায়। কাইলা আমগাছের আড়ালে পড়ে। একটা ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া গোলাপের বুকে মুখে চুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুকের কাপড়টা একটু বেসামাল হয়। পাশ ফিরে তা টানতে গিয়েই দেখে রেণুবালা ঘরে ঢুকছে।

'রেণুবালা ?'

লাফ দিয়ে উঠে বসে গোলাপ। উঠে দাঁড়ায়। দরজার সামনে দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে।

'আরে রেণু তুই ! তুই আবার কবে এলি ?'

'যদি বলি এই এনু।'

'বিশ্বাস করবো।'

'যদি বলি কাল এয়েচি।'

'বিশ্বাস করবো না।'

'যদি বলি, না, না, কাল নয়, পরশু এলাম।'

'তবে তো আরও না।'

'কেন ?'

'ওঃ বাবা ! কেন, তারও কি আবার ব্যাখ্যা করতে হবে ? সোনাক্ষেতের সবাই যে কথাটা জানে, সে কথাটা আবার তোকে বুঝিয়ে দিতে হবে ?'

এবারে হাসল রেণুবালা। হুজনেই বসল। পাশাপাশি। বলল, 'না; সত্যি পরশু এয়েচি রে। শরীরটা ভালো ছিল না, তাই তোর কাছে আসি নি। নইলে তোর বিয়ের ঢোলে কাঠি পড়েছে, তা শুনেও কি আমি ঘরে বসে থাকতাম ?'

বিয়ের প্রসঙ্গ আসতেই হঠাৎ যেন ছাই হয়ে গেল গোলাপ। রেণুবালাকে দেখে যে আনন্দ তার হু'চোখে নেমে এসেছিল, চোখের নিমেষে তা যেন নিবে গেল। কি একটা কথা বলতে গিয়েও যেন বলতে পারল না গোলাপ। গলাটা তার ধরে এল। হুটি চোখ ছলছল ক'রে উঠল।

রেণুবালা বুঝল সব। বুঝবেই বা না কেন? গোলাপের মনের কথাটা তো তার আর অজানা নয়। তিন সখীতে মাখামাখি—রেণুবালা, গোলাপ আর লাবণ্য। তারা সকলে সকলের কথা জানে। পুতুল খেলার দিন থেকেই যে তিনজনে সতীশঠাকুরের আখড়ায় গিয়ে গোপীনাথের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে,

'হে গোপীনাথ ভগবান
এই আমাদের মনস্কাম.
শিবের মতন বর দিয়ো
মস্ত বড় ঘর দিয়ো।
গোহাল ভরা গরু দিয়ো
গোলা ভরা ধান দিয়ো।

আজ তিনজনে তিনদিকে ছিটকে থাকলেও কারো মনের কথা কারো অজানা নয়। তাই গোলাপের মনের কথাটা বুঝেই সে তাড়াতাড়ি বিয়ের কথা ছেড়ে অন্য কথা ধরল। বলল, 'আজ খুড়ীকে আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিয়েছি জানিস গোলাপ? বলে কিনা—'

কিন্তু কামিনীসুন্দরী কোন্ কথা বলে গোলাপের সে কথা জানবার উৎসাহ নেই। সে ফ্যালফ্যাল ক'রে রেণুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেও মন তার কোথায় যেন ডুব দিয়েছে। চোখের দৃষ্টি স্থির। মনের মতো চোখের দৃষ্টিও যেন কোথায় কার সন্ধান করছে। কাজেই বেণুবালাকে থামতে হলো। থেমে চুপ ক'রে রইল। দু'জনেই। সারা ঘরে একটা থমথমে ভাব। শুধু বাইরের সজনে ডালে বসে একটা শালিক মাঝে মাঝে শিস্ দিয়ে ডেকে উঠছে।

'রেণু!'

'বল্।'

'একটা কথা বলবি?'

'কি কথা?'

গোলাপ থামল। কি একটা কথা যেন সে বলতে যেয়েও বলতে পারছে না। সে কথার উত্তাপে তার চোখের দুটি ঘন কৃষ্ণ তারা যেন জলজল ক'রে জলে উঠছে।

পশ্চিমের সূর্যটা 'কাইলা আম' গাছের আরও নীচে নেমে গেছে। একটা

শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। সজনে ডালের শালিকটা হঠাৎ ফুড়ুৎ ক'রে কোথায় যেন উড়ে গেল!

রেণুবালা বলল, 'কি রে থামলি কেন? কি বলতে চেয়েছিলি বল না?'

'বলবো?'

একটা সংকোচে গোলাপের দুটি গাল আরও যেন লাল হয়ে উঠল।

রেণুবালা বলল, 'কি রে, বল না!'

গোলাপ আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। তার হৃদয়ে যে মস্ত বড় একটা ঝড় চলেছে, সে কথাটা বুঝেই রেণুবালাও আর তাকে বিরক্ত করল না। সে পাশের জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলল।

'আচ্ছা, এ কি পাপ নয়?'

সচেতন মন যে কথাটা এতক্ষণ বহুকষ্টে আটকে রেখেছিল, গোলাপের অবচেতন মন হঠাৎ যেন সে কথাটা বাইরে ঠেলে দিল।

কথাটা বলতে পেরে অনেকটা হালকা হলো গোলাপ। অনেকটা স্বাভাবিক হলো। সংকোচের পর্দাটা ছিঁড়ে যেতেই সে অনেকটা প্রগল্‌ভ হলো। রেণুবালার চোখে দুটি চোখ রেখে সে আবার বলল, 'আচ্ছা, তুই-ই বল রেণু, এ কি পাপ নয়?'

রেণুবালা হঠাৎ কিছু বুঝতে পারল না। বলল, 'কি?'

'একজনকে ভালোবেসে আর একজনকে বিয়ে করা?'

রেণুবালা হঠাৎ এ কথার উত্তর দিতে পারল না।

গোলাপ আবার বলল, 'যাকে নিয়ে ঘর করবো, তাকে নিয়ে শুধু ঘরই করবো। মনে তার ঠাঁই হবে না কোন দিন। মন আমার লুটে নেবে আমার ভালোলাগা সেই ভালোবাসার মানুষটিকে। বল্ রেণু, এ পাপ নয়? এ প্রতারণা নয়?'

গোলাপের কথা শুনে একটু যেন বিস্মিতই হলো রেণুবালা। গোলাপ এতটা ভাবতে পারে, আর সেই ভাবনাকে এমন ক'রে গুছিয়ে বলতে পারে সে কথা সে কিছুক্ষণ আগেও যে ধারণা করতে পারে নি। তাই প্রথমটায় সে গোলাপের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারল না। পারল না বলেই হয়তো গোলাপের মুখের দিকে চেয়ে সে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল।

গোলাপ বলল, 'কি রে, আমার কথার জবাব দিলি নে?'

'কি জবাব দেবো ভাই?'

'যা তোর মন চায়।'

'আমার ?' বলতে বলতে গোলাপের ডান হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিল রেণুবালা। একটু চাপ দিল। দু'হাতে ধরে একটু নাড়াচাড়া করল। তারপর বলল, 'শুধু চাইলেই কি আর সব জিনিস মেলে সই ?'

গোলাপ-কথা বলল না।

রেণুবালা বলল, 'মেলে না। এ জগতে কত নারীই তো কত পুরুষকে পেতে চেয়েছে। ভালোবেসেছে। কিন্তু সকলের আকাঙ্ক্ষা তো পূর্ণ হয় নি।'

গোলাপের চোখের দুটি তারা যেন জলে ডুবে গেল।

রেণুবালা বলল, 'পূর্ণ হয় নি বলেই কি কেউ তার ভালোবাসার মানুষকে ভুলতে পেরেছে ? পারে নি। তবুও তারা ঘর করেছে। সংসার করেছে। ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'জীবনটা কালীদি'র পাঠশালার অঙ্ক নয় ভাই, এ সব সময় ছক ধরে চলে না।' বলতে বলতে রেণুবালার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে গেল।

বাইরে কামিনীসুন্দরী কার সঙ্গে যেন একটানা বকে চলেছে। পাড়ার ক'টি ছেলেমেয়ে সরকারদের মাঠে হল্লা করছে। পুঁটি পিসী ক'টা ছাগলকে তাড়া দিয়ে বাড়ীর দিকে নিয়ে চলল। রেণুবালা ও গোলাপ দু'জনেই চুপচাপ রইল কিছুক্ষণ। মাথাটা একটু নীচু ক'রে কি যেন ভাবল দু'জনেই। কি একটা গভীর ব্যথায় কেউ যেন কারোর মুখের দিকে চাইতে পারল না।

কিছুক্ষণ পর গোলাপ নিজেই আবার স্তব্ধতা ভাঙল। বলল, 'একটা কাজ করবি রেণু ?'

'বল্।'

'রসিকদাকে একবার খবর দিতে পারিস্ ?'

'রসিকদা !' একবার ম্লান হাসল রেণুবালা। সে হাসির মাঝেও তার চোখ দুটি টলমল ক'রে উঠল।

'হ্যাঁ রে, আজ তাকে আমার বড় দরকার। বড় দরকার। তার মুখ থেকে উত্তর না পেলে আমি যে কিছুই ঠিক করতে পারছিনে রে।'

রেণুবালা চুপ ক'রে রইল।

গোলাপ বলল, 'সে কাছে এলে তাকে শুধু একটা কথাই জিজ্ঞেস করবো রেণু। বলবো, রসিকদা, সে রাতের বকুল মালাটির সবগুলি বকুলই কি তুমি ঝরিয়ে দিয়েছো ? যদি ঝরিয়েই দিয়ে থাকো, তাহলে সে বকুলের পাগল-করা

সুবাসকে আমার মন থেকে মুছে দাও রসিকদা। সে সুবাস মনে রেখে আমি যে কারো গলায় মালা পরাতে পারি নে।' বলতে বলতে গোলাপের দু'চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

রেণুবালা বলল, 'সে উত্তর হয়তো এ জনমে আর পেলিনে গোলাপ!'

'কেন?' গোলাপের গলাটা যেন কেঁপে উঠল।

'রসিকদার সঙ্গে বোধ হয় আর তোর দেখা হলো না।'

এবারে মুখটা যেন বিবর্ণ হয়ে গেল গোলাপের। অনেক হতাশার অন্ধকারে আজ পর্যন্তও সে বুঝি একটা আশার ক্ষীণ বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিল, রেণুবালার কথায় যেন সে বাতিটি নিবে গেল। ধড়ফড়িয়ে সে বলে উঠল 'কেন? কি হয়েছে রসিকদা'র? দেখা হবে না কেন তার সঙ্গে?'

রেণুবালা বলল, 'সে যে আর সোনাক্ষেতে নেই গোলাপ। শুনলাম, রাজেন জ্যাঠা নাকি তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে চিরদিনের মতো সোনাক্ষেত ছেড়ে গেছে।'

'ছেড়ে গেছে? রসিকদা 'তা'হলে আর ফিরবে না সোনাক্ষেতে?' বলতে বলতে গলাটা যেন ধরে এল গোলাপের। এবারে যেন সে একেবারেই ভেঙে পড়ল।

রেণুবালা বলল, 'পদ্মঠাকুমা তো আমায় সে-ই কথাই শোনাল। দুপুরে আমায় একলা পেয়ে বুড়ীর সে কি হাউহাউ ক'রে কান্না! রাজেন জ্যাঠা নাকি তাকে অপমান করেছে। রসিকদাকে নাকি জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।'

'ভীরু, ভীরু, কাপুরুষ।' গোলাপ হঠাৎ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলল, 'যে পুরুষ তার নিজের জিনিসকে ধরে রাখতে পারে না, নিজের মানুষকে কেড়ে নিতে পারে না, তাকে কাপুরুষ বলা ছাড়া আর কি বলতে পারি? আর কি বলতে পারি?'

গোলাপ রেণুবালার বুকে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল।

বার

প্রথমে যতটা সহজ মনে হয়েছিল, কার্যকালে ততটা সহজ হলো না। বিয়ের হলুদ গায়ে পড়তে গোলাপের মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। হলুদের উগ্র গন্ধ তার মনের দৃঢ়তাকে ভেঙে দিল। ছবির পর ছবি ভিড় ক'রে এল তার চোখের সামনে। কত কথা গানের মতো সুরেলা ক'রে তুলল তার মনকে।

সৌদামিনী গান করতে বসেছিল। গান শেষে উঠে এল গোলাপের কাছে। চিবুকটা ধরে একটু নাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'হলুদ মেখে একি করেছিস্ লো গোলাপ! একেবারে যে রূপের আগুন জ্বেলেছিস্। রূপ যেন শত জিব বাড়িয়ে খাঁ খাঁ করছে।'

সৌদামিনীর সঙ্গে গোলাপের সম্পর্কটা রসিকতা করবার সম্পর্ক। অন্যদিন হলে হয়তো সে প্রতিআক্রমণ করতো সৌদামিনীকে। তার অতীত জীবনের অনেক কাহিনী নিয়ে টানাটানি করতো। কিন্তু আজ কিছুই বলল না গোলাপ। বলতে পারল না। কেবল তার লাল ঠোঁটে একটু হাসির স্বর্ণরেখা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা ক'রেই সে বিরত রইল। সৌদামিনী কি মনে করল কে জানে! সে আর কথা না বাড়িয়ে বাইরে চলে গেল।

রাত এখনও সাফ হয় নি। পুবের আকাশে শুকতারাটা দপ্‌দপ করছে। বাতাসে একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ আসছে। ঘরের কোণে জ্বলছে একটা তেলের বাতি। দু'চারজন লোক এখনও ঘরে-বাইরে আনাগোনা করছে।

একটা নতুন পাটিতে বসেছে গোলাপ। নতুন লালপেড়ে শাড়ী পরনে। হলুদ মাখা। নতুন কাপড়ের গন্ধ, হলুদের গন্ধ তার রক্তে কেমন যেন একটা জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। মাথাটা ভোঁভোঁ করছে। কান দুটি ঝাঁ ঝাঁ করছে। বুকটা, মুখটা ঘেমে উঠছে ঘন ঘন। আজ বড় গভীরভাবে মনে পড়ছে রসিকচন্দ্রের কথা। মনে পড়ছে আর বুকের বাম পাশটা দাপিয়ে দাপিয়ে উঠছে। হায় রে! ছোটবেলা থেকে যাকে আপন ভেবে এসেছে, যার চোখের সামনে তিলে তিলে বিকশিত ক'রে তুলেছে নিজেকে, আড়াপাড়ার শিবের

মাথায় যার নাম মনে রেখে শিবরাত্রিতে জল ঢেলেছে, সেই রসিকচন্দ্র কাল থেকেই তার পর হয়ে যাবে। এ জীবনে আর তাকে কাছে পাবার আশা থাকবে না। যাকে ভালোবাসবে না, ভালোবাসতে পারবে না; হয়তো যার সঙ্গে কোনদিন মনেরও মিল হবে না, তেমনি একটা মানুষের কাছে তাকে সারাজীবন পড়ে থাকতে হবে! কথাগুলি ভাবতে গিয়ে গোলাপের দু'চোখ জলে ভরে এল। কয়েক ফোঁটা বুকেও পড়ল। বুকটাকে দলিত-মথিত ক'রে ঝড়ো হাওয়ার মতো একটা দীর্ঘশ্বাস হুহু ক'রে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বিয়ের কাজ সমাধা হলো মঙ্গল মতোই। ধামরাই থেকে কুটুম্ব বেশী আসে নি। যে ক'জন আসার কথা ছিল, কুটুম তার চেয়েও কম এসেছে। কাজেই তাদের আদর-আপ্যায়ন করতে গোপাল চক্রবর্তীর মোটেই অসুবিধা হয় নি। তারা খেয়ে-দেয়ে প্রসন্ন মুখে গোপাল চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেছে।

বলেছে, 'বড় তৃপ্তি পেলাম, আপনার বাড়ী এসে বড় তৃপ্তি পেলাম বেহাই।'

গোপাল চক্রবর্তী কথা কয় নি। দু'হাত কচলাতে কচলাতে মুখে একটু মিষ্টি হাসি হেসেছে। কৃতজ্ঞতার হাসি।

কুটুমদের কেউ কেউ তাদের অভিজ্ঞতার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে, মাথা চুলকিয়ে তিনবার হিসেব ক'রে দেখিয়েছে যে এমন শৃঙ্খলাপূর্ণ বিয়েতে তারা নাকি ইতিপূর্বে আর কোথাও উপস্থিত থাকে নি।

গোপাল চক্রবর্তীর দুটি চোখ জ্বলজ্বল ক'রে উঠেছে। খুশীতে। আনন্দে।

দুয়ারে 'বাসি বিয়ের' আয়োজন হয়েছে। 'বাসি বিয়ের' পরেই গোলাপ চলে যাবে। ঘাটে নাও প্রস্তুত। বরকর্তারা ইতিমধ্যেই হাঁকডাক শুরু করেছে।

'এই যে ঠাকুরমশাই।' আর গৌণ কেন, কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে দিন। পাকা ছয়টি মাইল পথ তো উজিয়ে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়াই ভালো। আকাশের অবস্থাটাও বিশেষ সুবিধে নয়।'

'না, না, আর গৌণ কি? কই গো, সৌদামিনী, গৌরের মা, তোমরা সব করছো কি? তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে কাজটা চুকিয়ে দাও।' বলে গোপাল চক্রবর্তী কার অনুসন্ধানে যেন বাড়ীর ভেতরে ঢুকল।

পদ্মঠাকুমা এসেছিল দুপুরে। বাড়ীর এ পাশটা অনেকটা নিঃঝুম। পাশের বাড়ীর একটা আমগাছ কাত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এ বাড়ীতে। জায়গাটিতে ছায়া ফেলেছে। হাতের লাঠিটা ঠুক ঠুক করতে করতে সেই ছায়ায়ই এসে বসেছিল পদ্মঠাকুমা।

কামিনীসুন্দরী তা দেখে একেবারে হাউমাউ ক'রে উঠেছিল, 'ওমা, ও কি, ও কি করছো গো ঠাকরুন? ওখানে কেন? ঘরে এসো, আমার গোলাপকে একটিবার আশীর্বাদ ক'রে যাও।'

পদ্মঠাকুমা তা যায় নি। এই জায়গাটিতেই বসে পড়েছে। বসতে বসতে বলেছে, 'না গো বউ, না। ও ভিড়ে আমায় যেতে বলো না। তার চেয়ে এখানেই আমি বসি। তুমি বরং কাউকে দিয়ে গোলাপকে একবার ডাকিয়ে দিও।'

গোলাপ এসেছিল।

প্রথমটা পদ্মঠাকুমার মুখের দিকে তাকাতে পারে নি গোলাপ। মাথা নীচু ক'রেই দাঁড়িয়েছিল। কেমন একটা সংকোচ, কেমন একটা লজ্জা যেন তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। চোখ দুটি উঠেছিল ছলছল ক'রে।

পদ্মঠাকুমা বলেছিল, 'ও মা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস, এখানটায়ই বোস।'

গোলাপ বসেছিল।

পদ্মঠাকুমা নাড়িয়ে দিয়েছিল তার চিবুকটি। মাথা থেকে লাল ওড়নাটা নামিয়ে দিয়েছিল। তারপর চুপসে আসা দুটি গালে একটু হাসির রং লাগিয়ে বলেছিল, 'কি রে, বরকে ক্যামুন লাগছে? মনের মতো হয়েচে তো?'

গোলাপ আবার মাথাটা নামিয়ে নিয়েছিল। দুটি দীঘল চোখের দৃষ্টি মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে একটা আমের পাতা দিয়ে জায়গাটিতে এলোমেলো দাগ কেটেছিল।

পদ্মঠাকুমা বলেছিল, 'তা প্রথম প্রথম একটু সরম হবে বই কি বাছা। ও আমাদেরও হয়েছিল। তোর দাদামশাই যখন সাত পাক ঘুরে আমায় নিয়ে আসেন তখন তো আমি কাপড়ও পরতে শিখি নি। সোয়ামী কি ধন তা-ও ভালো ক'রে বুঝতাম না, তবুও সেই বয়সেই—'

পদ্মঠাকুমার কথা ফুরোবার আগেই উঠে পড়েছিল গোলাপ। পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু পারে নি। পদ্মঠাকুমা খপ ক'রে তার শাড়ীর আঁচলটা ধরে

ফেলেছিল। বলেছিল, 'ও মা, আগ রাতেই এমন ধারা, শেষ রাতে না জানি কি হয়! বলি, ঐ মনচোরা কালাকে এক নিমেষ না দেখলেই বুঝি মূর্ছা যাস?'

'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি আর ও-কথা বলো না ঠাকুমা। ও-কথা তুলো না।'

'ক্যানরে, নাম নিলেই কি প্রেম হয়? নাম নিলে কি আর তোর 'তাকে' কেড়ে নিলাম? তবে হ্যাঁ, থাকতো যদি সেই আগের বয়েস, সেই সোনামাজা গায়ের রং, সেই দীঘির মতো গভীর দুটি কালো চোখ, সেই ভরা বুক, তাহলে নয় একবার চেষ্টা ক'রে দেখতাম। কিন্তু এখন আর তাকে কোন্ যাদুতে মজাবো? কি দেখিয়ে ভুলাবো?' বলে পদ্মঠাকুমা নিজের রসিকতায় নিজেই হোহো ক'রে হেসে উঠেছিল।

এবারে গোলাপ দুটি চোখ তুলে পদ্মঠাকুমার মুখের দিকে চেয়েছিল। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিঁদুর, দুটি কপোলও তার সিঁদুর-লাল। চোখ দুটি জল টলটল। কয়েক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়েছিল সে চোখ থেকে।

তা দেখে চমকে উঠেছিল পদ্মঠাকুমা। বলেছিল, 'ও কি রে? কাঁদছিস কেন? কাঁদছিস কেন? এ দিনে কি কাঁদতে আছে?'

পদ্মঠাকুমার কথায় গোলাপের কান্না আরও বেড়ে গিয়েছিল। পদ্মঠাকুমা এগিয়ে এসেছিল গোলাপের আরও একটু কাছে। তার মাথাটা টেনে নিজের বুকের কাছে নিয়েছিল। তারপর আঁচলে গোলাপের চোখের জল মুছাতে গিয়ে তার নিজের চোখেও জল এসে পড়েছিল।

বলেছিল, 'ও দুশমনের কথা ভুলে যা দিদি!'

'দুশমন?'

কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে গোলাপ যেন শিউরে উঠেছিল।

'মনে যে শুধু কাঁটা হয়েই রইল, ফুল হয়ে ফুটল না কোনদিন, তাঁকে দুশমন ছাড়া আর কি বলতে পারি?'

'রসিকদা কি কোনদিনই আর সোনাক্ষেতে ফিরবে না ঠাকুমা?'

'ওঃ, তাহলে সব কথাই তুই শুনেছিস্?'

'শুনেছি, রেণুবালা বলেছে।'

'বাড়ী থেকে এসে সারাটা রাত তো আমার পাশেই ছিল। সারাটা রাত শুধু ছটফট আর কান্না। পুরুষ মানুষ যে এভাবে কাঁদতে পারে ও দুশমনকে না দেখলে কোনদিনই তা আমার প্রত্যয় হতো না।'

গোলাপ নিশ্চুপ।

'হ্যাঁ, আমিও জেগেছিলাম অনেকক্ষণ। চাঁদটা গড়িয়ে গড়িয়ে পশ্চিমে ঢলে পড়ল। মজুমদারদের চকে একপাল শিয়াল খানিকক্ষণ একসঙ্গে চীৎকার ক'রে চুপ করল। কিন্তু ও দুশমনের কথা যেন আর ফুরোতে চায় না।'

গোলাপের বুক থেকে ঝড়ো হাওয়ার মতো একটা হুহু করা দীর্ঘশ্বাস উড়ে গিয়েছিল। চোখ থেকে বুঝি আবার কয়েক ফোঁটা জলও ঝরে পড়েছিল।

পদ্মঠাকুমা বলেছিল, 'এ্যামুন ভালোবাসা আর আমি চোখে দেখি নি দিদি। আমি-ঠাকুর দেবতার গান গাই। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কথা শোনাই। কিন্তু এ প্রেম যেন সে প্রেম থেকে ছোট নয়।'

'ঠাকুমা!'

গোলাপের স্বরটা যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর শুনিয়েছিল।

'বল।'

'তুমি ঠাকুর-দেবতা মানো?'

'সে কি কথা রে? ঠাকুর-দেবতা মানবো না কি? যাঁদের কৃপায় এ মানব জনম, যাঁদের দয়ায় এ ভুবন দর্শন, সেই ভুবনমোহনকে কি কেউ না মেনে পারে?' বলে পদ্মঠাকুমা দু'হাত এক ক'রে প্রণাম করেছিল।

গোলাপ বলেছিল, 'যে মানে সে মানুক, আমি কিন্তু আর মানিনে।'

'সে কি রে! ঠাকুর-দেবতা মানিসনে কি?'

'না।'

গোলাপের স্পষ্ট জবাব।

'কেন?'

'সে আর তুমি শুনতে চেয়ো না ঠাকুমা, সেকথা আমি বলতে পারবো না।' বলে গোলাপ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল। কয়েক ফোঁটা জলও পড়েছিল তার চোখ থেকে। মুখ ঘুরিয়ে হয়তো সেই জল লুকিয়েছিল।

পদ্মঠাকুমাও যেন কথা হারিয়েছিল। হঠাৎ কোন কথা কইতে পারে নি।

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

একটা ঝিরঝিরে হাওয়া ধীরে ধীরে বইছে। আমের পাতাগুলি শিরশির ক'রে কাঁপছে। এখন দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। কালকের খাটাখাটুনির পর

এখন অনেকে বিশ্রাম করছে। কাজেই বিয়ে বাড়ীর সোরগোল কম। এ পাশটায়ও লোকজনের বড় একটা আনাগোনা নেই।

গোলাপের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে পদ্মঠাকুমা বলেছিল, 'আমি সব জানিরে, আমি সব বুঝি। প্রেমের ঠাকুর বুঝি মানুষের চোখের জল দেখতে ভালোবাসেন। কিশোর বেলার প্রেম তাই বুঝি চির অভিশপ্ত। জীবনের প্রথম প্রেম তাই বুঝি কোন কালেই সফল হয় না।'

বলতে বলতে দু'চোখ ঝেপে জল এসেছিল পদ্মঠাকুমার। চোখের কোণ থেকে জলের দুটি চিকন ধারা নেমে এসেছিল তার চুপসে যাওয়া দুটি গালে। পদ্মঠাকুমা তা ঢাকবার চেষ্টা করে নি। মোছবার চেষ্টা করে নি। সেদিকে লক্ষ্য না ক'রেই সে বলেছিল, 'তাই বলে ভগবানকে যেন কোন দোষ দিস্ নি গোলাপ। তিনি যা করেন, হয়তো ভালোর জন্যেই করেন। আমরা মুখ্যু মানুষ, তাই সব সময় তার অর্থ খুঁজে পাইনে।'

গোলাপ এর কোন জবাব দেয় নি।

একটু থেমে পদ্মঠাকুমাই আবার বলেছিল, 'তোদের দুটির হাত মিলিয়ে দিতে পারলে আমিই হয়তো সবচেয়ে বেশী খুশী হতাম রে। তা যখন হলো না, তখন যাকে পেলি তাকে নিয়েই সুখী হবার চেষ্টা কর।'

'সুখী!'

কথাটা কেমন যেন বিদ্রূপের মতো শুনিয়েছিল গোলাপের মুখে। তীরের মতো বুকটা ভেদ ক'রে বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে গিয়েছিল।

বলেছিল, 'ও সুখ বুঝি এ জনমে আর হলো না ঠাকুমা।'

'সে কি রে?'

'না। রসিকদা যদি কোনদিন সোনাক্ষেতে আসে তাহলে তাকে বলো, এ জনমে আমার সুখকে আমি ধলেশ্বরীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম।' বলেই আর দাঁড়ায় নি গোলাপ। পদ্মঠাকুমার পায়ের সামনে ঢিপ ক'রে একটা প্রণাম ক'রেই সে ছুটে পালিয়েছিল। পদ্মঠাকুমা আর তাকে পিছু ডাকে নি। ডাকতে ভরসা পায় নি। শুধু সেই পথের দিকে চেয়ে চেয়ে তার ছানি-পড়া দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছিল।

তের

শ্বশুর-শাশুড়ী লোক মন্দ নয়। শ্বশুর কাঁরবারী লোক। প্রায় সব সময় কারবার নিয়েই থাকে। বাইরের লোকের সঙ্গে কথা কইবার ফুরসুত তার কম। আর কখনো সখনো বললেও 'কেমন আছো? কাজ-কারবার কেমন চলছে?' ইত্যাদি ধরনের দু'একটি গদ-বাঁধা কথা 'লেই সে কাজ সারে। শাশুড়ী সুরেশ্বরীর সারাদিনেও যেন হাতের কাজ ফুরোয় না। সে এটা করে, সেটা করে, এটা ধোয়, সেটা ধোয়। সারাদিন জল ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে তার হাতের চেটো আর পায়ের তলা যেন অনেকটা ক্ষয়ে গেছে। বছরের অধিকাংশ সময়ই তাতে ঘা থাকে। এ ঘা বাড়লেও সে কাজ বন্ধ করে না। তাতে কয়েক পোঁচ আলতা লেপে সে আবার কাজে হাত লাগায়। কেউ বলে, এ তার নেশা। কেউ বলে, এ তার রোগ। সুরেশ্বরী সব শোনে। বলে, 'কুচকুরে মাগীদের মুখে আগুন দি, মুখে আগুন দি, আমি কি কারো বুকে উনুন খুঁড়তে গেছি, না কারো বাড়া ভাতে ছাই দিতে গেছি যে সবাই আমার পেছু লাগতে আসে? পয়পাত হবে, পয়পাত হবে। জ্বলে-পুড়ে মরবে। যারা আমায় জ্বালাতে আসে তারা সব জ্বলে-পুড়ে মরবে।' বলতে বলতে সুরেশ্বরী দু'হাত এক ক'রে কার উদ্দেশ্যে যেন প্রণাম জানায়।

তবে গোলাপকে পেয়ে সুখীই হয়েছে সুরেশ্বরী। সারাদিন তাকে প্রায় বসিয়েই রাখে। কোন কাজে হাত দিতে দেয় না। গোলাপ তাতে আপত্তি করলে সুরেশ্বরী হাসে। বলে, 'তোমাদের দিন তো সামনেই রয়েছে বৌ, সারাটা জনমই তো খাটবে। তবে আমি যে ক'দিন আছি, তোমাকে একটু সোয়াস্তি দিয়ে যাই।'

গোলাপ বলে, 'আপনি খাটবেন আর আমি বসে বসে খাব? লোকে শুনলে বলবে কি? আর এমনিই বা সেটা কেমন দেখায়?'

লোকের নাম শুনলেই জ্বলে ওঠে সুরেশ্বরী। গোলাপের কথায় তাই সে একটু উত্তেজিতই হয়ে ওঠে। বলে, 'ও বাড়ীর ঐ কানী বামনী কিছু বলে গেছে বুঝি? নিশ্চয় কিছু বলেছে। তা তুমি ওর কথায় কান দিয়ো না বৌমা, লোকের পেছনে লাগাটাই ওর স্বভাব। এই দোষেই তো সারা জীবন ও

সোয়ামীর ঘর করতে পারল না।' বলে সুরেশ্বরী কানা বামনীর উদ্দেশ্যে কয়েকটি চোখা চোখা বিশেষণ প্রয়োগ ক'রে নিজের কাজে চলে যায়।

শাশুড়ীকে মন্দ লাগে না গোলাপের। মাথায় একটু ছিট আছে। তা থাক। তাতে কোন অসুবিধা নেই তার। গোলাপকে সত্যি সে ভালোবাসে। নিজের মেয়ে নেই। সুরেশ্বরী যেন গোলাপের মধ্য দিয়ে সেই মেয়ের সাধ মেটাতে চায়। গোলাপ সেটা বুঝতে পারে।

আর শ্বশুর? শ্বশুর তো তাকে 'মা' 'মা' বলতেই পাগল। দিনে যে ক'টা মুহূর্ত সে বাড়ী থাকে গোলাপকেও তখন তার কাছে কাছে থাকতে হয়। 'মা গামছাখানা দাও' 'মা পান বানাও' ইত্যাদি ফাইফরমাস তখন তাকে প্রায়ই শুনতে হয়। এ নিয়ে সুরেশ্বরীর সঙ্গে শ্বশুরের মাঝে মাঝেই কলহ বাধে।

গোলাপ তখন বিব্রত বোধ করে।

কিন্তু স্বামী কাছে এলেই যেন দম আটকে আসে গোলাপের। সারাটা গা যেন ঘেমে ওঠে। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে। স্বামীর অস্তিত্বই তার কাছে তখন অসহ্য বলে মনে হয়।

স্বামী ব্রজেশ্বর হাবা, বোকা। ভালো ক'রে সে কথাও বলতে জানে না। হাঁ ক'রে খুব টেনে টেনে সে কথা বলে। তখন তার বড় বড় লাল দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ে। কখনো কখনো থুথুও ছিটকে যায়।

কিন্তু তাই বলে স্ত্রীর উপর স্বামিত্ব ফলাতে কম যায় না ব্রজেশ্বর। তার পেটে ভালো বুদ্ধির ঠাঁই না হলেও দুষ্ট বুদ্ধি যেন গিস্‌গিস্। এ কথায় সে কথায় সে গোলাপকে আঘাত করে। বিদ্রূপ করে। নানা কু-ইঙ্গিত করে। মাঝে মাঝে তার দৌরাত্ম এত দূরে গিয়ে পৌঁছোয় যে তা শুনলে যে কোন ভদ্র সন্তান তার প্রতিবাদ না ক'রে পারবে না। কিন্তু গোলাপ সব কিছু সহ্য করে। কারো কাছে কিছু বলে না।

সেদিন শুক্লপক্ষের কি যেন এক তিথি।

আকাশে ভরা চাঁদ সোনার থালার মতো ঝিকমিক করছে। একটা ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। রাত অনেক। বাড়ী নিস্তব্ধ। কিন্তু ব্রজেশ্বর এখনও ফিরে নি। পাড়ার ওধারে মতি ফকিরের আখড়া। রোজ রাতেই সেখানে আড্ডা জমে। ব্রজেশ্বরও সেখানে যায়। নানা জনে নানা কথা বলে ও আখড়া সম্পর্কে। শ্রীহরি চক্রবর্তী নিজেও ব্রজেশ্বরকে সে কথা

শোনায়। ব্রজেশ্বর সে কথা শুনেও যেন শোনে না। রোজ রাতে তার সে আখড়ায় যাওয়া চাই। মতি ফকিরের কাছ ঘেঁষে বসা চাই। নইলে যেন তার রাত আর কাটতে চায় না।

সেদিনও আখড়ায় গিয়েছিল ব্রজেশ্বর। গোলাপ তার জন্যে অনেকক্ষণ বসে রইল। ধীরে ধীরে সারা পাড়া এল নির্জন হয়ে। বাড়ীর লোকজন সব ঘুমিয়ে পড়ল। গোলাপ এসে বসল একটি জানালার ধারে।

জানালা দিয়ে অনেক দূর দেখা যায়। সামনেই বংশী নদী। বংশীনদীর ওপারে ঐ কালো গ্রামটির মাথায় ক'টি তালগাছ, দুটি কোঠাবাড়ী। জানালায় এসে দাঁড়ালে সব কিছুই চোখ পড়ে। একলা ঘরে থাকতে পারে না গোলাপ। একলা ঘরের নির্জনতায় অনেক স্মৃতি তার মনে ভিড় ক'রে আসে। তাকে জ্বালায়। তাকে কাঁদায়। তখনই তাড়াতাড়ি জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় সে। বংশী নদীর ঢেউ যেখানে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছে, সে দিকে সে চেয়ে থাকে। মনটাকে ভুলিয়ে রাখে।

সেদিনও জানালায় দাঁড়িয়েছিল গোলাপ। আকাশের চাঁদ বংশীনদীর নীল জলে যেন স্নান করছে। তার রূপে ঝিলমিল করছে জল, স্থল। তীরের গাছগাছালির পাতাগুলি ফুরফুরে হাওয়ায় যেন একটা হিসহিস শব্দ করছে।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। খট্ খট্ খট্।

গোলাপ ফিরে দাঁড়াল।

দরজায় আবার শব্দ হলো। এবারে শব্দটা আরও জোর শোনাল। গোলাপ কাছে গেল। বলল, 'কে?'

বাইরে থেকে একটা বিশ্রী রকম গালি দিয়ে উঠল ব্রজেশ্বর। আরও জোরে একটা ধাক্কা মারল দরজায়। তারপর বিড়বিড় ক'রে খানিকক্ষণ কি যেন বলল। সব কথা তার বোঝা গেল না।

প্রথমটায় চমকে উঠেছিল গোলাপ। ভয়ই পেয়েছিল। কি করবে সে ভেবে উঠতে পারে নি। শুধু সারাটা গা তার থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছিল। ঘেমে উঠেছিল।

'এ—ই, এ···ই···ই···ই···ই···'

আবার ডাকল ব্রজেশ্বর।

কি করবে গোলাপ? ব্রজেশ্বর বুঝি নেশা করেছে। নেশা না করলে

মানুষ এমন অসভ্য হতে পারে? উত্তরের ভিটায় শ্বশুরের ঘর। এঘর থেকে তার দূরত্বও বেশী নয়। এ সব বিশ্রী গালাগাল তার কানে যেতে কতক্ষণ? যদি সত্যি সব কথা তার কানে যায়, তাহ'লে কি ভাববে সে গোলাপকে?

'এ…ই…শা…লী…'

তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিয়েই গোলাপ এক পাশে সরে দাঁড়াল।

টাল সামলাতে না পেরে একটা ঝড়ো হাওয়ার মতো আঙিনায় ছিটকে পড়ল ব্রজেশ্বর। একটা অশ্লীল গালি দিয়েই আবার উঠে দাঁড়াল।

গোলাপ দু'হাতে দরজাটা ঠেলে বন্ধ ক'রে দিল।

'এ…ই… এ…ই…'

'এ কি করছো তুমি? এ কি বলছো?'

গোলাপ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে জ্বলছে একটা লণ্ঠন। পুরনো চিমনিতে কালি পড়েছে। আলোটা স্পষ্ট নয়। সেই মৃদু আলোতেই ব্রজেশ্বরকে দেখল গোলাপ। দেখল, ব্রজেশ্বরের দুটি চোখ যেন ঠিকরে বেরুতে চাইছে। অস্বাভাবিক লাল। কিন্তু জলজলে। মুখের দু' কষে ফেনা জমেছে। হাঁ করলেই একটা গন্ধ আসছে ভুরভুর করে। সে গন্ধ নাকে গিয়ে পেটটা যেন গুলিয়ে উঠছে গোলাপের। লোকে যাকে মদ বলে, এ কি তবে সেই মদের গন্ধ? ব্রজেশ্বর তাহ'লে মদ খায়?

ঘৃণায়, ক্ষোভে গোলাপের দুটি চোখে জল এল।

ব্রজেশ্বর বলল, 'আ…য় না, ই…দি…কে আয়'…গোলাপের মুখের দিকে কুতকুত ক'রে তাকাল ব্রজেশ্বর।

গোলাপ সরে গেল। জানালার ধারে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু ব্রজেশ্বর ছাড়বার পাত্র নয়। গোলাপের কাছে গিয়ে হাত ধরে টেনে আনল তাকে। তক্তপোষের উপর শুইয়ে দিল।

'ছাড়ো, একি করছো? ছেড়ে দাও আমায়?' গোলাপ জোর ক'রে ওঠবার চেষ্টা করল। পারল না। গোঁয়ার ব্রজেশ্বরের হাতের চাপে তার বুকটা যেন থে তলে যেতে লাগল।

ব্রজেশ্বর বলল, 'আমি…বু-ঝি…বু-ঝি না কিছু? হাবা বোকা হলেও… আমি…স-ব বুঝি।'

'কি বোঝ তুমি?…'

'হে হেঃ হেঃ। স···ব বুঝি। গোবিন্দ···আ-মা-য় স-ব বলেছে। স-ব বুঝিয়েছে।'

'গোবিন্দ?' একটা বিস্ময়ের ছায়া নামল গোলাপের টানাটানা দুটি চোখে।

ব্রজেশ্বর বলল, 'তো—র—স্ব-ভাব ভালো নয়? তুই এঁঠো। অন্যে তো—কে—এঠোঁ—ক'রে দিয়েছে?'

এই বর্বর ইঙ্গিতের কোন প্রতিবাদ জানাল না গোলাপ। শুধু মনে হলো, তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ যেন ছুটোছুটি করছে।

ব্রজেশ্বর বলল, 'কি; চু-উ-প ক'রে র—ই—লি যে? ব—ল্, ঠি—ক্ ব—লে—ছি কি-না, ঠি—ক ধ-রে-ছি কি-না?'

'[illegible]ম ছাড়ো আমায়। ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি ছেড়ে দাও আমায়' বলতে গিয়ে গোলাপ হুহু ক'রে কেঁদে ফেলল।

'হ্যাঁ—গোবিন্দ—এ—ক-থাও ব—লেচে। ব—লেচে, দেখিস্ বেজা, এ-ক-থা তু-ই বলতে গেলে তো-র স্ত্রী—কেঁ-দে ফেলবে। চোখের—জল ফেলে—তোকে—ভুল বু—ঝাতে চাইবে। সাবধান, তুই—তা দেখে—গলে যা-স-নে যেন? না—না— আমি গলবো না। আমি—পুরুষ মানুষ— আমি—গলবো না।'

'নচ্ছার!'

উত্তেজনায় প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল গোলাপ।

ব্রজেশ্বর বলল, 'আ—র, আ—র ফাঁকি—দিবি কি ক'রে? ঐ জানালায় —দাঁ—ড়িয়ে কার—কথা—ভাবিস্, সে—বুঝি আমি জানিনে?'

গোলাপ কোন উত্তর করল না।

ঐ—কি—যেন—নাম? রসে। গোবিন্দ—গোবিন্দ—বিয়েতে—গিয়ে সব—শুনে এয়েছে। মতির মা বলেচে।'

এবারে গোবিন্দকে চিনতে অসুবিধে হলো না গোলাপের। বিয়ের দিন থেকেই সে অনেকবার তার কাছে এসেছে। নানা সময়ে নানা কথা নিয়ে, গোলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে।

কিন্তু লোকটিকে মোটেই ভালো লাগে না গোলাপের। কেমন যেন তীব্র তার দু'চোখের দৃষ্টি। কিসের যেন লোভ তার ইঙ্গিতে। সে কাছে এলেই গোলাপ সরে বসেছে।

ধূর্ত গোবিন্দ তা বুঝতে ভুল করে নি। বলেছে, 'তোমার ভারি সরম বৌ!'

গোলাপ মাথা নীচু করেছে।

'আরে আমার কাছে অত লজ্জা কেন? আমি তো আর পর কেউ নই। একেবারে ব্রজেশ্বরের ইয়ার! মাই ডিয়ার।' বলে খানিকক্ষণ হো-হো ক'রে হেসেছে গোবিন্দ।

গোলাপ আমতা-আমতা ক'রে বলেছে, 'ও তাই বুঝি? তাই বুঝি?' গোবিন্দ উৎসাহ পেয়েছে। হাতের কোচাটা পকেটে পুরে বসে বসেই সে গোলাপের আরও খানিকটা কাছে এগিয়ে এসেছে।

গোলাপের বুক, মুখ ঘেমে উঠেছে। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারে নি।

সেই গোবিন্দই একদিন বিকেলে এল।

ব্রজেশ্বর বাড়ী ছিল না। বোধ হয় দোকানে বসেছিল। সুরেশ্বরীও বিকেলের কাজকর্ম শেষ ক'রে বাড়ী টহল দিতে গেছে।

'এই যে বউ?' ঘরের বাইরে থেকেই কথা বলল গোবিন্দ।

গোলাপ শুয়েছিল। গোবিন্দকে দেখেই ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। বলল, 'সে তো বাড়ী নেই।'

'দরকারটা তো আমার তার কাছে নয় বৌ।'

'তবে?'

কি যেন ভেবে একবার এ-দিক সে-দিক তাকাল গোবিন্দ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'খুড়িমা কোথায়, খুড়িমা?'

গোবিন্দ সুরেশ্বরীকে খুড়িমা বলে ডাকে।

গোলাপ বলল, 'তিনিও নেই। বোধ হয় পাশের বাড়ীই গেছে।'

'যাক বাঁচা গেল।' বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গোবিন্দ। তারপর ঘরে আসতে আসতে বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা ছিল বৌ, ক'দিন বলবো বলবো ক'রেও তা বলতে পারি নি।'

গোলাপ তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'না, না। আপনি ঘরে আসবেন না। মা দেখলে—'

'কিচ্ছু বলবে না। এ বাড়ীতে তো তুমি নতুন এয়েছো বৌ, তাই এ বাড়ীতে গোবিন্দ চক্কোত্তির আধিপত্যটা কতখানি তা এখনো তুমি মালুম করতে পারো নি।'

গোলাপ একেবারে দরজার সামনে এগিয়ে এসেছে। দু'টি কান তার লাল হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ যেন খুব গম্ভীর হয়ে উঠল গোবিন্দ। গম্ভীরভাবেই বলল, 'আমি কিন্তু জানি।'

'মানে ?'

'মানে রসিকচন্দ্রের সরস কথা আমিও কিছুকিছু শুনেছি কি না ? ভারি মিষ্টি, ভারি মিষ্টি। ও সব কথা শুনতে ভারি মিষ্টি লাগে। বলতে বলতে আবার সেই দুটি ধারাল দৃষ্টি তুলে গোলাপের দিকে তাকাল গোবিন্দ।

গোলাপ যেন কাঁপছে। তার দুটি চোখ যেন জ্বলছে।

তাতে মোটেই নিরুৎসাহ হলো না গোবিন্দ। বলল, 'ও সব কিছু নয় বৌদি, সব কিছু নয়। ঐ যে কথায় বলে না, 'সব জন্তু মোট বয়, ধরা পড়েছে গাধা, সব নারী সতী কবলায়, কলঙ্কিনী রাধা। সব নারীই—'

'আপনার কথা শেষ হয়েছে ?'

'না।'

'না হলেও তা আর আমার শোনবার প্রয়োজন নেই।'

'বৌ!'

'না, না।' বলেই গোলাপ ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

সেই গোবিন্দ—সেই গোবিন্দ চক্রবর্তীই উত্তেজিত করেছে ব্রজেশ্বরকে। গোবিন্দ ধারণা করেছিল, হাবা-বোকা ব্রজেশ্বরকে কোনদিনই ভালোবাসতে পারবে না গোলাপ। মনে তার একটা চাপা বিক্ষোভ সব সময়ই ধিকি ধিকি জ্বলবে। সেই বিক্ষোভের সূত্র ধরেই এগিয়ে যাবে গোবিন্দ। গোলাপের নারী মন গভীর তৃষ্ণায় যখন ছটফট করবে, তখন সে তার তৃষ্ণা মেটাবে।

গোবিন্দ বোধ হয় অঙ্ক কষতে ভুল করে নি। ব্রজেশ্বরকে সত্যি ভালোবাসতে পারে নি গোলাপ। ভালোবাসা তো দূরের কথা, ব্রজেশ্বরের অস্তিত্বই যেন তার কাছে অসহ্য বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে গোলাপের পুড়ে খাক্ হয়ে যাওয়া শূন্য হৃদয়ে গোবিন্দও ঠাঁই করতে পারে নি।

বড় জ্বালা নিয়ে সেদিন ঘরে ফিরেছিল গোবিন্দ চক্রবর্তী। যাবার সময় বলে গিয়েছিল, গোলাপের দেমাক সে ভাঙবে। রসিকচন্দ্রের রসালো কাহিনী সে বাজারে ছাড়বে। তার সতীত্বপনা ঘোচাবে।

গোলাপ সে কথায় কান দেয়নি। গোবিন্দর মুখের সামনেই দরজায় ধাক্কা মেরে সে অন্যত্র চলে গেছে।

সেই গোবিন্দই আজ ছোবল মেরেছে।

ব্রজেশ্বর যেন আর মানুষ নেই। বুনো, একেবারে বুনো হয়ে গেছে ব্রজেশ্বর। হু'টো চোখ তার জ্বলছে। মুখ দিয়ে কেমন একটা চোক চোক আওয়াজ করছে। আর মাঝে মাঝে হাসছে, হোহো ক'রে সজোরে হেসে উঠছে।

'ছাড়ো ছাড়ো।'

বুকে বড় চাপ লাগছে গোলাপের। ভালো ক'রে সে যেন দম নিতেও পারছে না।

ব্রজেশ্বর বলল, 'তাহলে······বল্······আ······মা···য় স······ব বল।'

'কি বলবো?'

'বু···ঝ···লি নি? আমি জানি······বে······শ বুঝে···ছিস্। হাঃ···হাঃ ···হাঃ······' বলতে বলতে আবার সজোরে হেসে উঠল ব্রজেশ্বর।

গোলাপ কোন জবাব দিল না।

ব্রজেশ্বর বলল, 'ভারি···মজা···না? ভাত···খা···বি···আমার···আর··· নাম···নিবি···কালার? ভারি···মজা। ভারি···মজা।'

এবারও গোলাপ কোন কথা কইল না।

ব্রজেশ্বরই আবার বলল, 'গোবিন্দ কি···বলচে···শু-নবি? গোবিন্দ··· ব—লেছে, তোতে—আর—র বাজা—রের মেয়েতে কোন তফাত—নেই। কোন তফাত—নেই।'

এবারে আর সইতে পারল না গোলাপ। রক্ত যেন তার দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল। দুটি চোখে যেন অস্বাভাবিক একটা জ্বালা ধরে গেল। এক ঝাপটায় ব্রজেশ্বরকে সরিয়ে দিল সে। মাতাল ব্রজেশ্বর দাওয়ায় ছিটকে পড়ল। প্রথমটায় খানিকটা ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ করল। তারপর আবার সে ওঠবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাইরের খড়মের খটখট আওয়াজ হতেই সে চুপচাপ পড়ে রইল।

শ্রীহরি চক্রবর্তী দরজার সামনে এসে ডাকল, 'বৌ মা, দরজাটা একবার খোল তো।'

চোদ্দ

গোলাপ সোনাক্ষেতে খবর পাঠিয়েছিল।

প্রতি সোম ও শুক্রবার ধামরাইএর হাটে যায় হরমোহন। কামিনীসুন্দরী একদিন তার কাছে এসে কেঁদে পড়ল, 'মেয়েটা ফিরে উল্টে গেছে কতদিন হলো। আমার বুক জ্বলে যায়। তোমার দাদা তো একবারও তাকে আনবার নামটি পর্যন্ত করে না।'

'আসবে, না হয় ক'দিন পরেই আসবে।' একটু থেমে আবার বলছিল হরমোহন, 'আর আজকালকার মেয়েরা কি ঠিক আগের মতো আছে বৌ, আজকাল দেশের হাওয়া ঘুরে গেছে না? আজকালকার মেয়েরা বোঝে স্বামীর সংসারই তার সংসার। কাজেই সেই স্বামীর সংসার ছেড়ে সহজে তারা বাপের বাড়ী আসতে চায় না।'

'নাগো, না। গোলাপ আমার তেমন মেয়ে নয়। আমায় না দেখে সে একটা নিমেষও থাকতে পারে না। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সে না যেন কত ভাবছে। কত কাঁদছে। ওগো, আজ তুমি আমায় কথা দিয়ে যাও ঠাকুরপো, যত কাজই তোমার হাতে থাক না, আজ একবার তুমি ওকে দু'চোখে দেখে আসবে।' কামিনীসুন্দরী কেঁদে হরমোহনের হাতদুটি জড়িয়ে ধরেছিল।

তাই গোলাপকে দেখতে গিয়েছিল হরমোহন। একটু বেলাবেলিই গিয়েছিল। তখনও রোদ পড়ে নি। তবে তার রংটা যেন অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছিল। ছেলেকে দোকানে রেখে হরমোহন শ্রীহরি চক্রবর্তীর বাড়ী গিয়েছিল।

হরমোহনকে কাছে পেয়ে সবই খুলে বলেছিল গোলাপ। বলতে বলতে কেঁদেছিল।

হরমোহন তাকে বুঝিয়ে ছিল, স্বামীর ঘর করতে এসে প্রথম প্রথম এক আধটু অসুবিধে হয়। কিন্তু তাই বলে কেউ কি আর স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ী চলে যায়? আর তা গেলেও ক'দিন আর থাকে সে বাপের বাড়ী? মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হলেই না আবার সে শ্বশুরবাড়ীর উনোনের

লাকড়ি ঠেলতে আসে। যাকে বলে হিঁদুর বিয়ে—একবার দুটি আঁচলে গেঁট লাগাল তো এ জীবনে আর সে গেঁট ছাডানো যায না।'

হরমোহনের এ সব তত্ত্বকথা ভালো লাগে নি গোলাপের। তত্ত্ব—আর জীবন সত্য অনেক সময়ই এক কথা নয়। তত্ত্বের সূত্র অনেক সময়ই জীবন সত্যের সঙ্গে মেলে না। তাই মানুষ অনেক সময়ই তত্ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

গোলাপ হরমোহনকে তাই বলেছিল, 'তোমাদের ওসব পুঁথির কথা বুঝিনে কাকু, আমি সোজাসুজি বুঝেছি, এখানে থাকা আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়।'

'বলিস্ কিরে!' গোলাপের কথা শুনে যেন চমকে উঠেছিল হরমোহন। গোলাপ বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। তোমরা যদি আমাকে নেযার ব্যবস্থা না করো কাকু, তা হ'লে এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, তোমরা আর আমার মুখ দেখবে না।'

বলতে বলতে গোলাপের দুটি গাল জলে ভেসে গিয়েছিল।

'ষাট, ষাট, ও কি কথা বলছিস্ রে! ও কথা কি মুখে আনতে আছে? মুখ দেখবো না কি বললি! যদ্দিন সোনাক্ষেতে না যাস্, তদ্দিন প্রতি হাটে এসে আমি তোকে দেখে যাবো। তোকে আমি কথা দিযে গেলাম।'

গোলাপ আর কথা বাড়ায় নি। হরমোহন পান খেয়ে, তামাক টেনে চলে গিয়েছিল।

এর পরে আরও ক'দিন কাটল। আসছে বুধবার: রথ। ধামরাইএর রথ বিখ্যাত। এ অঞ্চলেরই নয শুধু, বহু দূর দূর থেকে লোক আসে রথ দেখতে। সার্কাসের দল, ম্যাজিক পার্টি, রাধা চক্কর আরও কত কি তামাসা আসে। নৌকায় নৌকায় বংশী নদীর জল আর দেখা যায় না। ঢাকা, নারাযণগঞ্জ প্রভৃতি শহর থেকে বড় বড় কোষ নৌকাও আসে। দিন দশেক দিনে-রাতে উৎসব যেন আর ভাঙে না। বিশেষ ক'রে রথের দুটি দিন লোকের ভিড়ে তো পথ চলাই ভার।

এবারও সার্কাস আর ম্যাজিকের দল ইতিমধ্যেই 'তাম্বু' ফেলেছে। দেশ-বিদেশের দোকানীরা এসে দোকান খুলেছে। রথতলার মাঠে

চলেছে নানা রকম আয়োজন। এ পাঁড়া সে পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা গলাগলি ধরে সকাল-বিকাল তা দেখতে আসছে।

আজ ক'দিন ধরেই রসিকচন্দ্রকে বড় বেশী ক'রে মনে পড়ছে গোলাপের। বড় বেশী ক'রে। রসিকচন্দ্রের চোখমুখ যেন তার চোখের পাতায় লেগে আছে। ছোটবেলায় তারা ও রথে আসত। সোনাক্ষেত থেকে ধামরাইএর দূরত্ব তো আর খুব বেশী নয়। মাত্র ছয় মাইল। কাজেই রথের ক'দিন আগ থেকেই সোনাক্ষেতে সাজো সাজো ব উঠত। সমবয়সীরা দল বেঁধে নাও করত। তাছাড়া পাঁচমিশালী লোকের নাও-ও থাকত। তার সোয়ারী ছোট-বড় সকল বয়সের নরনারী। নাও-এর মেয়ে সোয়ারীরা গান ধরত, রাধাকৃষ্ণের গান। নিমাই সন্ন্যাসের গান। মিলনের গান। বিচ্ছেদের গান। বংশী নদীর উথাল ঢেউ নাও-এর তলায় বাড়ি খেয়ে যেন সে গানের তাল রাখত।

সে-বছরের কথাটা এখনও মনে আছে গোলাপের। পাড়ার অনেকে রথে গেছে। গোলাপ যেতে পারে নি। কামিনীসুন্দরী যেতে দেয় নি। গোলাপ তাই মুখ ভার ক'রে ঘরের এক কোণে বসেছিল। বসে বসে কাঁদছিল।

এমন সময় নতুন বর্ষার খলখল করা স্রোতের মতো রসিকচন্দ্র ছুটে এল। 'গোলাপ, এই গোলাপ!'

কামিনীসুন্দরী ওপাশের উঠোনটা লেপছিল। রসিকচন্দ্রের আওয়াজ পেয়ে সে-ই বলল, 'এই যে বাবা রসিকচন্দ্র, তা একেবারে যে ঘোড়া ছুটিয়ে এলে হে। বলি খবর কি?'

রসিকচন্দ্র বলল, 'এই যে মাসিমা, খবর ভালো। নাও, তবে চল।'

কামিনীসুন্দরী ম্লান হেসে বলল, 'কোথায়?'

'কেন রথে? ধামরাই।'

'নাও কোথায়?'

'সে সব তোমাদের ভাবতে হবে না। আমি নাও-এর ব্যবস্থা করেছি। বাবাকে ধরতেই তিনি নাও-এর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। নমঃ পাড়ার সনাতন মোড়লের নাও গো, সেই লম্বা গয়নার নাওখানা। অনেক লোক ধরবে।'

'সে কথা বলে বলেই বুঝি বাড়ী বাড়ী তুমি টহল দিয়ে ফিরছো?'

এবারে জিভ কাটল রসিকচন্দ্র। বলল, 'না, না, টহল দিয়ে বেড়াবো কেন, মা বলে দিল তাই তোমাদের বলতে এলাম। নইলে আমার কি?'

রসিকচন্দ্রের উৎসাহে অনেকটা ভাটা পড়েছে। এবারে ফিক ক'রে হেসে ফেলল কামিনীসুন্দরী। মাটি-মাখা নুড়িটা হাতেই সে রসিকচন্দ্রের কাছে এল। বলল, 'বোকা ছেলে, এই কথায়ই মন খারাপ করতে আছে বুঝি?'

রসিকচন্দ্র মাথাটা আরও নীচু করল।

কামিনীসুন্দরী বাম হাতে তার চিবুকটি একটু নাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কে বলেছে, আমাদের কথা কে বলেছে?'

'মা।' রসিকচন্দ্র ধীরে ধীরে উত্তর দিল।

'সত্যি?'

'নয় তো, আমি তোমাদের সেধে নিতে এসেছি নাকি?' নাও-এর কথা শুনে গোলাপও বাইরে এসেছিল। সেও মায়ের আঁচলটা তার কচি হাতে জড়াতে জড়াতে বলল, 'চলো না মা, সবাই গেল আর আমরা যাবো না?'

'যাবো রে, যাবো। দাঁড়া আমি কাজকর্মগুলো একটু সেরে নি।'

সেবার রসিকচন্দ্রের সঙ্গেই রথে গিয়েছিল গোলাপ।

ওঃ, সে কী তার আনন্দ! আনন্দে সারাটা দুপুর হৈ-হল্লার মধ্য দিয়ে কেটেছিল। কিন্তু বিকেলের দিকে ঘটল বিপত্তি।

সেবার রথে এসেছিল কোমরগঞ্জের 'রয়াল ডায়মণ্ড সার্কাস।' নাম করা দল। তাদের নানান রকম খেলা।

'হাতীর খেইল, বাঘের খেইল। সবুজ টিয়া পাখীর খেইল।' অদ্ভুত রকমের পোষাক পরা কিম্ভুত কিমাকার সার্কাস-দলের লোকটি মুখে একটি টিনের চোঙ লাগিয়ে নিজেদের খেলার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছিল। চিৎকার ক'রে বলছিল।

টিকিটের হার বেশী নয়। দু'আনা আর এক আনা। দু' আনায় কাঠের গ্যালারিতে আর এক আনায় মাটিতে, চটে।

ওরা এক আনার টিকিটেই সার্কাস দেখতে ঢুকেছিল।

সার্কাসে লোক হয়েছিল মেলা। লোকের গায়ে লোক। লোকারণ্য। পুরো দেড় ঘণ্টা খেলা দেখানোর পর সার্কাস যখন ভাঙল তখন 'তাম্বুর' ভেতরটি যেন উথাল নদী ধলেশ্বরী। কার আগে কে বেরোবে তা নিয়েই ঠেলাঠেলি। ধাক্কাধাক্কি। এমনি একটা ধাক্কার ঠেলায় গোলাপও বাইরে বেরিয়ে এল। রসিকচন্দ্র কোন্ দিক দিয়ে বেরিয়েছে কে জানে!

'তাম্বু' থেকে একটু দূরেই একটা পচা পুকুর। পুকুর পাড়ে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ। একটি বট গাছ। যাত্রীদের কেউ কেউ তার তলায় রান্না-বান্না করছে। এক বুড়ো দু' আঙুলের মাঝে একটি সিগ্রেট চেপে ধরে কষে টান মারছে। বোঝা যায়, সিগ্রেট খেতে সে অভ্যস্ত নয়। রথে এসে সখ হয়েছে। তাই হয় তো এক পয়সায় একটি মাল খরিদ ক'রে তা পরীক্ষা ক'রে দেখছে।

প্রথমটায় এসব দেখতে ভালোই লাগল গোলাপের। ভাবল, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি, রসিকদারা নিশ্চয় এখানেই আসবে। কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও যখন নিজেদের লোকের মুখ দেখল না গোলাপ, তখন প্রথমে আস্তে, পরে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠল।

কান্নার শব্দে সেই সিগ্রেট খাওয়া বুড়ো চোখ খুলল। গোলাপের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তার কাছে এসে বলল, 'বারে বা, কাঁদছো কেন খুকুমণি?'

গোলাপ কথা বলল না।

'হারিয়ে গেছো বুঝি? তার জন্যে কান্না কেন? আমার কাছে বসো, নিশ্চয়ই তোমার বাবা এখানে খুঁজতে আসবেন।'

'বাবা আসে নি।'

'বেশ, বাবা না আসুন, আর কেউ এসেছেন তো!'

'মা এসেছে। আর রসিকদা—

'তা হলে তোমার মা আসবেন, নয় তো ঐ রসিকদা।'

'তারা যদি আমায় খুঁজে না পায়।'

'পাবেন গো, পাবেন। আর ওঁরা যদি না-ই আসেন তা হ'লে আমিই তোমাকে তোমাদের গাঁয়ে দিয়ে যাবো। তোমাদের গ্রামের নাম কি?'

গোলাপ চোখের জল মুছতে মুছতে উত্তর দিল, 'সোনাক্ষেত।'

'বাস্! বাস্! আর বলতে হবে না। সোনাক্ষেতের সোনা

তুমি তা আগে বলতে হয়। আগে বলতে হয়। আমাদের নাও যে সোনাক্ষেত দিয়েই যাবে গো। সোনাক্ষেতের রসগোল্লার কথা মনে হলে যে জিবে জল আসে। সোনাক্ষেতে নাও ভিড়িয়ে আমরা যে সেই রসগোল্লা নিয়ে যাবো।' বলতে বলতে বুড়ো যেন অতিরিক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

বুড়োর সঙ্গে কথা কইতে কইতেই গোলাপ দেখল ওপাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটার পাশ দিয়ে রসিকচন্দ্র হন্তদন্ত হযে ছুটে আসছে।

'ঐ যে রসিকদা!' বলেই গোলাপ দু'হাতে তালি বাজিয়ে উঠল। তার জলে ভিজা নরম দুটি কপোল যেন হাসিতে ঝিলমিল ক'রে উঠল।

বুড়ো তার দাঁতহীন দু'টো মাড়ি বার করে ফক্‌ফক্ ক'রে হাসল। বলল, 'আমি বলিছি না খুকুমণি, তোমার রসিকদা এল বলে।' বুড়োর চুপসে আসা দু'টো গালে আবার সেই হাসির চমক।

গোলাপ এবার আনন্দে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল, 'রসিকদা, রসিকদা, এই যে আমি।'

রসিকচন্দ্র কাছে এসে তার চুল ধরে টান মেরে গালে ঠাস ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিল। বলল, 'হতচ্ছাড়া মেয়ে! সবাই তোকে খুঁজে অস্থির, আর তুই এখানে দাঁড়িয়ে দিব্যি হাসছিস। চল্, তোকে নাযে তুলে হাত পায়ে শেকল দিয়ে রাখি গে।'

বুড়ো কাশফুলের মতো তার মাথার সাদা চুলগুলি ঝাঁকিযে ঝাঁকিয়ে বলল,

'নো, নো, নো, (no)
হাসি মুখে গো (go)।'

বুড়োর ভঙ্গী দেখে রসিকচন্দ্রও হাসি চেপে রাখতে পারল না।

'ঠাস'

সেই ঠাস শব্দটি এখনও যেন কানে বাজে গোলাপের। একটু নিভৃতে থাকলে, একটু আনমনে ফিরলে সে দিনের সেই একটি মাত্র শব্দ গোলাপের কাছে বড়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আজ রথ। সকাল সকালই ঘুম থেকে উঠেছে গোলাপ। স্নান সেরেছে। বহুদিন পরে আযনার সামনে বসে চুলে সে পাতা পেড়েছে। অনেক কষ্টে সীমন্তের সিঁদুর রেখাটিও মুছে ফেলল। আয়নার উপর

নিজের কুমারী মুখটিই বুঝি নিজে উপভোগ করল। কিন্তু এই উপভোগ করতে গিয়ে মনটি তার বিষণ্ণ হয়ে গেল। কানে এল তার সেই পরিচিত 'ঠাস' শব্দটি। মনে পড়ল অনেক কথা, অনেক কাহিনী।

বড় আশা ছিল গোলাপের, রসিকচন্দ্র আসবে। প্রতি সনই সে রথে আসত। এ সনও কি সে রথে না এসে থাকতে পারবে? পারবে না। সে নিজে আসতে না চাইলেও বন্ধু-বান্ধবেরা তাকে ধরে নিয়ে আসবে। গোলাপদের বাড়ীর ঘাটেই তো সব নাও লাগে। রসিকচন্দ্র যদি আসে তাহলে এখানেই যে সে নাও থেকে নামবে। গোলাপ আজ আর তার কাছে যেতে পারবে না। কথা বলতে পারবে না। কিন্তু দূর থেকে একবার দেখেও তো সে দু'চোখ সার্থক করতে পারবে! সেটাও কি আর কম লাভ!

কিন্তু রসিকচন্দ্র এ বছর রথে এল না।

সোনাক্ষেতের অনেকে রথে এসেছিল। তাদের কেউ কেউ গোলাপদের বাড়ী বেড়িয়ে গেল। পান-দোক্তা গালে ঠেলতে ঠেলতে অনেক কথা অনেক উপদেশ শুনিয়ে গেল। পাড়ার হারাণচন্দ্রও তাদের সঙ্গে এসেছিল। গোলাপ তাকে ডেকে ছাদে নিয়ে গেল। এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, একটা কথা বলবি হারু?

'কি গোলাপদি?'

'কাউকে বলবি নে?'

'হেঃ হেঃ, তুমিও যেমন! আমার কি ঠেকা পড়েছে যে আমি অন্যকে বলতে যাবো!'

'রসিকদা এখনও ফেরে নি?'

না।'

তার পর একটু থেমে হারাণচন্দ্র আবার বলল, সে তো তার মাসির বাড়ী আছে। বিরুলিয়া। ওখানকার স্কুলেই নাকি সে লেখাপড়া করবে। তবে ছুটি-ছাটায় সোনাক্ষেতে আসবে বই কি! সোনাক্ষেতে এলে রসিকদাকে তোমার কথা বলবো।' গোলাপের চোখে জল এসে পড়েছিল। মুখটি অন্যদিকে ঘুরিয়ে সে তা মুছে ফেলল। তারপর বলল, 'না-রে না, তোকে কিছু বলতে হবে না। কিছু বলতে হবে না। চল, চল, নীচে যাই।' বলে গোলাপ হারাণচন্দ্রকে নীচে নিয়ে এল।

পনের

গোপাল চক্রবর্তী লোক মারফত জানিয়েছে, 'আরও ক'টা দিন থাক মা। মাসতিনেক পরেই তো বড় পূজা। সেই বড় পূজার সময় আমি গিয়ে তোকে নিয়ে আসব এ ক'টা দিন তুই ধৈর্য ধরে থাক্।'

খবর শুনে গোলাপ চোখের জল আটকে রাখতে পারে নি। তার গাল বেয়ে বড় বড় ক'টি জলের ফোঁটা বুকে গড়িয়ে পড়েছিল। ধৈর্য ধরবো? কি ক'রে ধৈর্য ধরবো? এ নির্বান্ধবপুরীতে কেউ কখনও কি বাস করতে পারে? এখানে কেউ আমায় চায় না। ভালোবাসে না। এদের দৃষ্টি নয় যেন এক একটি সন্দেহের বিষাক্ত ফলা। উঠতে বসতে সব সময়েই সন্দেহ। এখানে যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। একথা আমি কাকে জানাই? কাকে বোঝাই! এমনি নানা কথা ভেবে গোলাপের মন খারাপ হয়ে যায়।

সেদিন শনিবার। কাল যশোমাধবের পুনর্যাত্রা শেষ হয়েছে। যশোমাধব আবার তাঁর নিজ গৃহে ফিরেছেন। মেলা নয় যেন ভাঙা হাট। মেলায় ভাঙন ধরেছে। দোকানীরা দোকান তুলে যে যার ঘরে চলেছে। রথতলায় আর ভিড় নেই। গ্রামেরই ক'টি ছোকরা রথের চাকায় বসে হয়তো ভাঙা উৎসবের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

কাল থেকেই মন ভালো ছিল না গোলাপের। কাল রেণু রথে এসেছিল। গোলাপের সঙ্গে দেখা ক'রে গেছে। অনেক কথা শুনিয়ে গেছে।

'রসিকদা সোনাক্ষেতে ফিরে এসেছে।'

'কবে এল রে?'

'এই দিন চার-পাঁচ হলো। পরশু না কবে যেন তাকে সেজেগুজে বাজারে যেতে দেখলাম?'

গোলাপ নিশ্চুপ।

'পদ্মঠাকুমা কাল এসেছিল আমাদের বাড়ীতে। আঃ, বুড়ীর যা হাল হয়েছে না, দেখলে চোখে জল আসে। সেই পদ্মঠাকুমাই অনেক দুঃখ ক'রে বলল—'

'কি ?'

এবার যেন অনেকটা সচেতন হয়েছে গোলাপ। দু'টি কাজল চোখের দৃষ্টি রেণুবালার মুখের উপর ছড়িয়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করল।

রেণুবালা বলল, 'সে কথা শুনে আর লাভ নেই ভাই, পুরুষ জাতটাই হলো বেইমান। তাদের স্বভাবটি হলো ঐ ভোমরার মতো, ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানো।'

গোলাপের মুখ থেকে কে যেন সবটুকু রক্ত চুমুক দিয়ে উঠিয়ে নিল। তার মুখটি কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রেণুবালা আবার বলল, 'ঐ যে নামা পাড়ার বিন্দুবাসিনী, ঐ যাকে নিয়ে রসিকদা মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টা করতো, আজকাল রসিকদা নাকি—'

'তিনি সুখী হোন রেণু।' বলতে বলতে গোলাপের দু'চোখ থেকে দুটি জলের ধারা নামল।

রেণুবালা বলল, 'পুতুল খেলার কথা কে কবে মনে রাখে ভাই। অমন পুতুল জীবনে কোন্ মেয়ে না খেলেছে। কিন্তু জীবনের আসল খেলা শুরু হতেই সব্বাই সে পুতুল খেলার কথা ভুলেছে।'

'আমায় মাপ কর্ রেণু।' বলে গোলাপ উঠে পড়েছিল।

কাল সারা রাত ঘুমোতে পারে নি গোলাপ। বিছানায় পড়ে সে শুধু এপাশ ওপাশ করছে। একটা তীব্র জ্বালায় সে শুধু ছটফট করেছে।

ব্রজেশ্বর হাঁ ক'রে শুধু দেখেছে। কিছু বলে নি।

কিন্তু আজ অন্য মূর্তি নিয়ে ঘরে ফিরল ব্রজেশ্বর। রাত কম হয় নি। রাস্তার লোক চলাচল এক রকম বন্ধ। পাড়া-পড়শাদের অনেকের ঘরের বাতিই নিবেছে। রাস্তাও তাই অন্ধকার।

গোলাপ পুবের জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিল। জানালার একটু দূরেই বংশী নদী। বংশী নদী এখানে খুব গভীর। স্রোতও দুরন্ত। কূলে কূলে আছাড় খেয়ে বংশী নদীর স্রোত যখন চলে তখন তার মাথায় ফেণার ফুল জমে। কোথাও বা একটা গভীর আওয়াজ ক'রে পাক খায়। মাঝি-মাল্লারা এখান দিয়ে নাও বাইতে গিয়ে চীৎকার ক'রে বলে: 'সামাল! সামাল!'

বংশীর ওপার শান্ত। কিসের আকর্ষণে বংশী যেন ওপারে তার দুরন্তপনা

বন্ধ করেছে। ওপারের লাল মাটির গা ধুইয়ে ধুইয়ে বংশী যেন ধীরে ধীরে দক্ষিণে চলেছে। ওপারে অজস্র আম-কাঁঠাল, তাল-তমালের বন। ছায়া শীতল। তারই ফাঁকে ফাঁকে জেলেদের ছোট ছোট বাড়ী। জেলে পাড়ায় কে যেন বাঁশের বাঁশী বাজায়। তারই সুর এপারেও আসে। আজও আসছে। বড় করুণ।

জানালায় দাঁড়িয়ে গোলাপ নদীর দিকেই তাকিয়েছিল।

ব্রজেশ্বর এল। বাইরে তার ডাক শোনা গেল, 'এই···এই··এই...'

জানালা থেকে ত্রস্তে সরে গেল গোলাপ। ঘরের মাঝখানটায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তার পা যেন আর সরছে না।

মুখে একটা অশ্লীল কথা উচ্চারণ ক'রে ব্রজেশ্বর আবার ডাকল, 'এই··· এই...'

গোলাপ দরজা খুলে দিল।

টলে পড়তে পড়তেও আবার নিজেকে সামলে নিল ব্রজেশ্বর। সামলে নিয়েই গোলাপকে উদ্দেশ্য করে একটা বিচ্ছিরি রকমের গাল দিল।

গোলাপ হ্যারিকেনের কমিয়ে রাখা সলতেটা বাড়িয়ে দিয়েছে। এ কী চেহারা হয়েছে ব্রজেশ্বরের! চোখ দুটি ডুগডুগে লাল। কিন্তু গভীর। মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলি উচ্ছৃঙ্খল। মুখের দু' কষ বেয়ে লালার মতো কি যেন গড়িয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে জিব বাড়িয়ে তা আবার চেটে ফেলছে ব্রজেশ্বর। জিব দিয়ে কি রকম একটা আওয়াজ করছে।

ভয় পেয়ে গোলাপ অনেকটা দূরে সরে গেল। কিন্তু দূরে গিয়েও রেহাই পেল না।

ব্রজেশ্বর আবার ডাকল, 'এই···এই···'

গোলাপ উত্তর করল না। মাথা নীচু ক'রে সে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। তার দু' চোখ ফেটে যেন জল আসছে।

টলতে টলতে ব্রজেশ্বর নিজেই গেল গোলাপের কাছে। তার একখানা হাত টেনে ধরল।

গোলাপ নড়ল না। সরল না। কথা কইল না। পাথরের মূর্তির মতো যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

ব্রজেশ্বর বলল, 'সে······সে······আ······আসে নি?'

এই 'সে' বলতে ব্রজেশ্বর যে কাকে বোঝাতে চাইছে সে কথাটা গোলাপ

সহজেই বুঝল। একটা বৃশ্চিক জ্বালায়, সারাটা শরীর যেন জ্বলে উঠল গোলাপের। চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে চোখ দুটি যেন অসম্ভব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক ঝাপটায় ব্রজেশ্বরের হাত থেকে নিজের হাতটিকে ছাড়িয়ে নিল সে।

বলল, 'যাও, যাও, এখান থেকে সরে যাও তুমি। তোমার দেহে পাপ, তোমার মনে পাপ। ও পাপ মন নিয়ে তুমি আমায় স্পর্শ করো না।'

'আর······আর······তুই? তুই······বুঝি······গঙ্গা······জলে······ধো······ধোওয়া······তু······তুলসী পাতা?' বলে ব্রজেশ্বর উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল।

বলল, 'গো···গোবিন্দ···গোবিন্দ···আজ···স···অ···সব বলেছে।'

গোলাপ কথা কইল না। একটা উত্তেজনায় যেন তার সারা দেহ কাঁপছে।

ব্রজেশ্বরই আবার বলল, 'সে মেলায়···এসেছিল। তু···তু···তুই জানালায়··· দাঁড়িয়ে···তার···স···অ···সঙ্গে···কথা···কয়েচিস্। গো···গো ··· গোবিন্দ তা···তার···নিজ···চক্ষে দেখেচে।'

'সে ভণ্ড। সে মিথ্যাবাদী।' গোলাপের কথাটা অনেকটা যেন ধমকের মতো শোনাল।

ব্রজেশ্বর রাগল না। হাসল। নেশা করলে সে খুব হাসে। হাসিটাই তার নেশার রোগ।

বলল, 'গোবিন্দ···গোবিন্দ···মি···মি···মিথ্যাবাদী, আর তু···তুই বুঝি··· সব···সত্যকথা···বলচিস? আমি···বুঝি···কিছু বুঝি না?'

গোলাপ নিরুত্তর।

'তোর...র···রসিক নাগর···এসেচিল, গো···গোবিন্দ তাকে নিজ...চক্ষে দেখেচে।

'তাহলে তুমি গোবিন্দর কথাই বিশ্বাস ক'রে থাকো। আমার সেখানে কথা বলে লাভ নেই।' বলে গোলাপ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'এই···এই···এই।' বলে ব্রজেশ্বর চীৎকার ক'রে উঠেছিল। কিন্তু বাইরে শ্রীহরি চক্রবর্তীর খড়মের শব্দ শুনে সে চুপ করল। বাবাকে তার বড় ভয়।

রাত অনেক। পুব আকাশে একটা তারা দপ্‌দপ ক'রে জলছে। ব্রজেশ্বরের হুঁশ নেই। পাশ ফিরে শুয়ে সে ঘোঁতঘোঁত করছে। গোলাপ ঘুমোতে পারে নি। ঘুম আসে নি। সারারাত ব্রজেশ্বরের পাশে পড়ে থেকে সে অনেক কথা ভেবেছে। মার কথা, বাবার কথা, রসিকচন্দ্রের কথা। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে বার বার চমকে উঠেছে সে। জলে গেল, পুড়ে গেল, তার সব স্বপ্ন ছাই হলো। তার জীবনের আর কোন দামই রইল না।

ভাবতে ভাবতে দু' চোখ ভরে জল এসেছে গোলাপের। চোখের জলে বালিশ ভিজেছে। বুকের বাম পাশটা কেমন যেন ব্যথা ব্যথা ক'রে উঠেছে।

বালিশে মুখটা চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে গোলাপ। তার বেদনার ঢলকে লক্ষ্য করবার মতো ঘরে আর কেই নেই।

সখীদের কথাও মনে পড়েছে গোলাপের। রেণুবালার কথা, লাবণ্যের কথা। রেণুবালার ছেলে হবে। তার জন্যে সারা বাড়ীতে আনন্দ। লাবণ্যর বর কলকাতার কলেজে পড়া ছেলে, সোনাক্ষেতের লোকের মুখে মুখে তার নাম। আর গোলাপ? যার সঙ্গে গোলাপের বিয়ে হয়েছে সে? ভাবতে গিয়ে গোলাপের মাথাটা ঘুরে গেছে। সে আর ভাবতে পারে নি। উঠে বসেছে।

পুব আকাশটা সাফ সাফ না? বংশী নদীতে কোন্ মাঝি যেন গানে টান দিয়েছে। শেষ রাতে নাও খুলে তারা বুঝি মোকামে রওনা হয়েছে। গোলাপ আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে এল। বাড়ীর খুব কাছেই বংশী নদী। সে বংশী নদীর তীরে গেল। বর্ষার বংশী যেন নাগিনী। ফুলে ফুঁসে দৌড়ে চলেছে। ছোট ছোট ঢেউগুলি যেন হাজার হাতে করতাল বাজিয়ে তার সঙ্গে ছুটছে।

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে একবার কার উদ্দেশে যেন প্রণাম করল গোলাপ। প্রণাম করতে যেয়ে তার দু'চোখ দিয়ে আবার হুহু করে জল নেমে এল। সে তা মুছল না। কপাল থেকে হাতও নামাল না। চোখের জল নিয়েই এবার সে বংশী নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঝুপ করে শুধু একটা শব্দ হলো। বংশী নদীর জল কিছুক্ষণ তোলপাড় হলো। তারপর তার স্রোত যেমন বইছিল তেমনি বইতে শুরু করল।

ষোল

ঢাকার বাইজী রতনবাঈ। রমনার ঘাসে ছাওয়া ময়দানটি ছাড়িয়ে যেখান থেকে মীরপুর রোড শুরু হয়েছে তারই বাম পাশে রতনবাঈ-এর মস্ত বাগানবাড়ী। এখানটায় তখন নতুন উপনিবেশ গড়ে ওঠে নি। রমনার এদিকটা তখন ছিল একেবারে ফাঁকা। নির্জন। রতনবাঈ-এর তখন উঠতি বয়েস। নতুন যৌবন। সেই যৌবন-সায়রে এসে ডুবে গেল ঢাকারই কোন নবাবসাহেব। রমনার এ বাগানবাড়ী তারই ভালোবাসার দান। শুধু বাড়ী দিয়েই কর্তব্য শেষ করলে না নবাবসাহেব। রতন-বাঈকে সে গড়ে তুলল। মনের মতো ক'রে তুলল। বিখ্যাত ওস্তাদ নারায়ণ রাও। তাকে রেখে গান শেখাল। রতনবাঈ-এর নাম ছড়াল। লক্ষ্ণৌর বাইজী "বাহান্ন ছুরি" ও তার গানের প্রশংসা ক'রে গেল।

সে সব অনেক কালের কথা।

সেদিনের কথা মনে পড়লে রতনবাঈ-এর চোখে আজও জল আসে। নবাবসাহেবের জন্যে মনটা তার ব্যথায় ভরে ওঠে। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মনের অনেকখানি আগুন বাতাসে উড়ে যায়। পশ্চিমের জানালার বাইরে যেখানে একটা চাঁপাফুলের গাছ অনেক বড় হয়েছে, রতনবাঈ সেদিকে চেয়ে থাকে। এইভাবে কতক্ষণ কাটে রতনবাঈ তার খেয়ালই করতে পারে না।

বয়েস হলেও গানটা ছাড়ে নি রতনবাঈ আজও তার ডাক আসে। পূজা-পার্বণে বকশিশ আসে। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো তার পাণ্ডুর কপোলে একটা হাসির আভা খেলে যায়। হয়তো পুরনো দিনের অনেক কথাই তার মনে পড়ে। রক্তে বুঝি জাগে একটা চাঞ্চল্য, মনে অস্থিরতা। হয়তো পুরনো দিনগুলির জন্যে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কিন্তু তবুও কাউকে ফেরায় না রতনবাঈ। শূন্য হাতে কাউকে ফেরাতে হয়তো তার কষ্ট হয়। সে যায়। গান গায়। তাতেই আনন্দ পায়।

দিগবাজারের রায়বাবুকে খুশী করবার জন্যে এবারও যেতে হয়েছিল রতনবাঈকে। রথে যেতে হয়েছিল। আয়নায় সাজানো 'গঙ্গা'

নামে যে কোষ নৌকাটি সদর ঘাটে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, রায়বাবু সেই নৌকাটিই ভাড়া করেছিল।

নৌকা দেখে রতনবাঈ খুশী হয়েছিল, বলেছিল, 'সুন্দর নাও।'

'তুমি যাবে, নাও কি সুন্দর না হযে পারে?'

'তাই নাকি?' বলে একটু হেসেছিল রতনবাঈ। আগের অভ্যাস মতো তার টানা টানা দুটি চোখের দৃষ্টি রায়বাবুর মুখের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনেছিল।

রায়বাবু বলেছিল, 'বযেস হলো, তোমার চোখের তেজ তো তবুও কমল না বাঈজী।'

রতনবাঈ খিলখিল ক'রে হেসে উঠেছিল।

রথের পরদিনও সারা রাত চলল গান। গান আর সরাব। শেষ রাতের দিকে মাঝিরা নোঙর তুলল। বর্ষায় বংশীর দুরন্ত স্রোত। দুরন্ত কাটাল। সেই দুরন্ত স্রোতে ভেসে কোষ নৌকাটি ঢাকার পথ ধরল।

শেষ রাতের মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়ায় সবার আমেজ লেগেছে। রতনবাঈ-এর গান ও বেশ জমে উঠেছে। বংশীর শিশু ঢেউগুলি কেবল নাও-এর গায এসে ভেঙে পড়ছে। ছল···ছল···ছলাৎ।

রতনবাঈ গান গাইছে।

শেষ রাতের পাণ্ডুর চাঁদ এখনও আকাশে রয়েছে। মাঝে মাঝে দু'এক টুকরো হাল্‌কা মেঘ তাকে জড়িযে ফেলছে। আবার ছেড়ে চলছে। তারই ছাযা পডছে বংশী নদীর জলে।

পশ্চিমের জানালাটা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তেই চমকে উঠল রতনবাঈ। তার কানের হাত নীচে নামল। গান থামল।

দিগবাজারের রাযবাবু তাঁর মাথার লম্বা লম্বা চুল ছড়িযে এতক্ষণ ঝিমচ্ছিল। রতনবাঈ-এর গান থামতেই সে চোখ মেলল।

বলল, 'বাঈজী!'

'আপনি ওদের নাও থামাতে বলুন। কে যেন ডুবে মরছে। হাবুডুবু খাচ্ছে।'

নেশা ছুটে গেল রায়বাবুর। লম্বা চুলে ঝাঁকি মেরে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। রতনবাঈও এল তার সঙ্গে।

'ঐ যে, ঐ যে—' বংশী নদীর জলের উপর কার যেন চুল ভেসে উঠেছিল রতনবাঈ সেদিকেই রায়বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

রায়বাবু বলল, 'ওরে, নাও থামা। কে যেন—'

কথা শেষ না হতেই দু'জন মাল্লা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বংশীর জলে ভেসে যাওয়া একগুচ্ছ চুলের প্রতি তাদেরও চোখ পড়েছিল। এবার তারা তাকে এনে নাও-এ তুলল।

নারী।

একটু আগেই হয়তো জলে পড়েছে। জল খেয়েছে। কিন্তু জ্ঞান হারায় নি। তবে খুব ক্লান্ত। মাল্লারা মেয়েটিকে ধরাধরি ক'রে কোষ নৌকার পাটাতনের উপর শুইয়ে দিল।

বয়েস বেশী নয় মেয়েটির। প্রথম যৌবন। বুকের চূড়ায় তারই উদ্ধত ঘোষণা।

রতনবাঈ ডাকল, 'মাঝি!'

বুড়ো মাঝি এগিয়ে এল। বলল, 'মা!'

'ওকে আমার ঘরে নিয়ে এসো মাঝি।'

কোষ নৌকায়ও রতনবাঈ-এর আলাদা ঘর। বিশ্রামের সময় সেই ঘরেই থাকে রতনবাঈ। সেখানে অন্য কারো প্রবেশাধিকার নেই। মাঝিরা মেয়েটিকে সেই ঘরে নিয়ে এল।

এবারে মেয়েটি চোখ খুলল। আস্তে···অতি আস্তে সে বলল, 'আমি কোথায়? আপনারা কারা?'

রতনবাঈ তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে জবাব দিল, 'ভয় নেই মা, তুমি অকূলে পড়ো নি। একটু সুস্থ হও, পরে সব কথা জানতে পারবে।'

মেয়েটি আবার চোখ বুজল।

ঘরের দরজাটি এবারে ভেজিয়ে দিল রতনবাঈ। হ্যারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিল। এক ঝাঁক আলো যেন হুড়মুড় ক'রে মেয়েটির সর্বাঙ্গে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

ভিজে কাপড় ছাড়াতে গিয়ে হাতটা একবার তাই কেঁপে উঠল রতনবাঈ-এর। একটা বুঝি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মেয়েটির যৌবন কানায় কানায় ঠাসা। ফুটন্ত, ফুলন্ত। এ দিন রতনবাঈ-এর জীবনেও এসেছিল। সে সবই আজ অতীতের মিষ্টি স্বপ্ন। ধন, জন, যৌবন, কিছুই চিরস্থায়ী নয়।

'মা।'

মা? আঃ, কি মিষ্টি ডাক। প্রাণটা যেন পুলকে নেচে উঠল রতনবাঈ-এর। তার ভাবনা অন্য পথে মোড় নিল। এতক্ষণ যে দৃষ্টি দেহের কানায় কানায় ফিরছিল, এবারে তা দেহকে ছাড়িয়ে দেহাতীত কোন্ রহস্যলোকে প্রবেশ করল। এমনি মিষ্টি একটি ডাক শোনার ক্ষুধা তো কম ছিল না রতন-বাঈ-এর। বাড়ীর চাকর-বাকরেরা, অনুগ্রহ প্রার্থীরা যখন ঐ নামে সম্বোধন করেছে রতনবাঈকে, তখন কোন কোন অসতর্ক মুহূর্তে তার বুকটা যে লাফিয়ে উঠেছে। কিন্তু একটু পরে নিজের ভুল বুঝেই মনটা তার ভরে গেছে হতাশায়। আজ এই নদীর উপর, এই নীরব, নির্জন ঘরে আবার সেই ডাক শুনে চোখের জল আর আটকে রাখতে পারল না রতনবাঈ। তার একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যেন জল হয়ে ছ'চোখ দিয়ে গলে পড়ল। মেয়েটির মুখের কাছে মুখ এনে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সে বলল, 'তোমার নাম তো আমি জানিনে মা, কি নামে ডাকব তোমায়?'

প্রথমটায় কোন উত্তর করল না মেয়েটি। চুপ ক'রেই রইল। কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'আমার নাম গোলাপ। গোলাপ নামেই আমায় ডেকো মা।'

গোলাপের কপালে নিজের ডান হাতখানা রেখে রতনবাঈ ভিজে গলায় বলল, 'গোলাপ! গোলাপ! আমার গোলাপ ফুল!'

উচ্ছ্বাসে, উত্তেজনায় গলাটা যেন তার ধরে আসতে চাইছে।

রতনবাঈ-এর কাছে কোন কিছুই লুকোল না গোলাপ। একে একে সব কথাই খুলে বলল।

রতনবাঈ বলল, 'সব কথাই বুঝলাম গোলাপ, কিন্তু তাই বলে আত্মহত্যা—'

'আমার যে আর পথ ছিল না মা।'

'আত্মহত্যা পাপ।'

'তা আমি জানতাম।'

'তবুও—'

'পরকালের কথা আমি ভাবি নি, আমি এ জীবনের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে চেয়েছি।'

'কি লাভ তাতে?'

'লাভালাভের কথা ভাবি নি। তবে বুঝেছি, জীবনে আমার যে দুঃখের বোঝা নেমে এসেছে—সে দুঃখকে বইবার ক্ষমতা আমার নেই।'

'তুমি ভুল করেছো।'

'হয়তো করেছি।'

'সে ভুল আবার তোমায় সংশোধন করতে হবে।' গোলাপ নিরুত্তর।

রতনবাঈ বলল, 'আমার কথার জবাব দিলে না?'

'জবাব দেবার আমার কিছু নেই মা?'

'তুমি বাড়ী ফিরবে না?'

'না।'

'কোথায় যাবে?'

'দু'চোখ যে দিকে যায়।'

'ভুলে যেয়ো না তুমি নারী।'

'সে আমি জানি।'

'জানো, এ সমাজে অনেক নরপশু আছে, অনেক—'

এবারে একটু হাসল গোলাপ। তার টলটল করা চোখে রতনবাঈ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'মরণকেই যে ডরায় না, তাকে আর কিসের ডর দেখাও মা? এ জীবনে যে পেল শুধু ধিক্কার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, জীবনের প্রতি তো তার কোন লোভ নেই।'

রতনবাঈ আর কথা বাড়াল না।

সতের

গোলাপকে তার রমনার বাড়ীতেই নিয়ে এল রতনবাঈ। বাড়ীর পুরনো চাকর হরিচরণ। গোলাপকে দেখে সে বলল, 'এ কে মা?'

'আমার মেয়ে।'

'আগে তো দেখি নি? এ্যাদ্দিন কোথায় ছিল?'

এবারে প্রায় ধমকে উঠল রতনবাঈ। বলল, 'তুই বাড়ীর কর্তা না কি যে সব জিনিস তোকে দেখতে হবে, জানতে হবে?'

হরিচরণ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'না, কর্তা হতে যাবো ক্যানে। তবে কোনদিন দেখি নি তাই—'

কোনদিন দেখিস্ নি, এখন থেকে দেখবি। যা তুই তোর কাজে যা, একেবারে কুঁড়ের বাদসা।

হরিচরণ হাসতে হাসতে চলে গেল।

দিন আর কাটে না গোলাপের। সারা দিন সে ঘরেই থাকে। বেরোয় না। বেরোতে মন চায় না। গত জীবনের সব কিছু স্মৃতি মুছে ফেলাটা প্রথমে সে যতটা সহজ ভেবেছিল, এখানে এসে সে দেখল যে কাজটা ঠিক ততটা সহজ নয়। গাছ বড় হতে পারে। আকাশে তার মাথা নাড়াতে পারে। ফুল ছড়াতে পারে! কিন্তু সে মাটিকে, মাটির গন্ধকে ভুলতে পারে না।

গোলাপও তাই তার ফেলে আসা দিনগুলিকে ভুলতে পারল না।

ঘরের পশ্চিম দিকেই সেই চাঁপা ফুল গাছ। তারপর খানিকটা ফাঁকা জমি। তারের বেড়া। এর পরেই সদর রাস্তা। ঢাকা-মীরপুর রোড। এই পথেই বাস যায়। সারা দিন। রাতেরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত। বাসের কণ্ডাক্টার একটা দড়ি টেনে টেনে টুংটাং ক'রে ঘণ্টা বাজায়। আর চীৎকার ক'রে বলে, 'মীরপুর...মীরপুর...সোনাক্ষে এ...এ...ত।

সোনাক্ষেত।

ঢাকার বাস সোনাক্ষেতেও যায়। এ রাস্তার সবগুলি বাসের দৌড়ই

সোনাক্ষেত পর্যন্ত। সোনাক্ষেতের বাজারে, পুণ্যহর চৌধুরীর 'চৌধুরী কেবিনে'র পাশে বাস স্টেশন। ছোটবেলায় গোলাপও গেছে সেখানে। বাস থেকে নামতে নামতে যাত্রীরা হাতের টিকিট ফেলেছে। গোলাপ সেগুলি কুড়িয়ে এনেছে। বাসের কণ্ডাক্টার আনোয়ার মিঞা চৌধুরী কেবিনের চা খেতে খেতে বলেছে, 'খুকা খুকী, টিকিস লিবে গো।'

গোলাপ কাছে যায় নি। দূর থেকে হেসে ছুটে পালিয়েছে। সেই বাস দেখে আর সোনাক্ষেতের নাম শুনে গত জীবনের অনেক কথাই মনে পড়ল গোলাপের। অনেক স্মৃতিই মনে তার ভিড় করে এল। চোখে জল নামল।

এভাবেই ক'দিন কাটল।

সেদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর রতনবাঈ বিশ্রামের আয়োজন করছে। আকাশটা আজ মেঘ মেঘ। কিন্তু বৃষ্টি নামে নি। শুধু একটা দুরন্ত পুবালি হাওয়া থেকে থেকে বাড়ীর জানালা-কপাটগুলিকে—তছনছ ক'রে যাচ্ছে।

গোলাপ রতনবাঈ-এর ঘরে গেল। মাথার কাছটায় বসল। কপালে হাত বুলোতে লাগল।

রতনবাঈ বলল, 'কিছু বলবে?'

গোলাপ কোন উত্তর দিল না।

রতনবাঈই আবার প্রশ্ন করল, 'আমায় কিছু বলতে চাও?'

শাড়ীর আঁচলটি একটা আঙুলের মাথায় জড়াতে জড়াতে গোলাপ বলল, 'হ্যাঁ?'

'বল।'

'আমি গান শিখবো।'

'গান শিখবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি তো তোমায় গান শেখাতে পারবো না মা।' বলতে বলতে রতনবাঈ তক্তপোষের উপর উঠে বসল। গোলাপ কোন উত্তর করল না। শুধু মাথাটি নীচু ক'রে শাড়ীর জড়ানো আঁচলটি আঙুল থেকে আবার খুলতে আরম্ভ করল।

রতনবাঈ বলল, 'রাগ করলে?'

গোলাপের দু'চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। রতনবাঈ গোলাপের আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মোছাতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলল! বলল, 'গানের বড় জ্বালা মা! যে জ্বালায় আমি নিজে জ্বলে মরছি, সে জ্বালায় আর তোমায় জ্বালাতে চাইনে।'

একটু থেকে আবার আরম্ভ করল রতনবাঈ, 'শহুরে মেয়ে আমি! বাপ ছিল, মা ছিল, ভাই বন্ধু সবই ছিল। কিন্তু তবুও একদিন সব ছাড়লাম। ঐ গানই আমার কাল হলো। ঐ গানই আমার কাল হলো। ঐ গানের টানেই একদিন ঘর ছেড়ে এলাম। তুমি মেয়ে, তোমাকে এর বেশী আর কিছু বলতে পারিনে।'

বলতে বলতে রতনবাঈ-এর গলাটা একটু ধরে এল। তার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে ঝড়ো বাতাসে হুহু ক'রে উড়ে গেল।

গোলাপ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আমি জ্বলতে চাই, পুড়তে চাই, মরতে চাই। নইলে কি আছে আমার? কি নিয়ে থাকব আমি? কি নিয়ে বাঁচব? জগতে সবাই যখন হাসবে তখন তাদের পাশে বসে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে চাইনে।'

'আবার যদি তোমার বিয়ে দি?'

মাতৃস্নেহে প্রশান্ত রতনবাঈ-এর চোখে একটা প্রসন্ন দৃষ্টি।

'না।'

'কেন?'

'জানিনে।' বলে গোলাপ সে ঘর থেকে ছুটে পালাল।

রতনবাঈ তক্তপোষ ছেড়ে উঠল। ঘরময় কিছুক্ষণ পায়চারী করল। তারপর হতাশায় ম্লান হয়ে একগুচ্ছ বাসি গোলাপের মতো বিছানায় এলিয়ে পড়ল।

বাইরে তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত রতনবাঈকে হার মানতে হলো। তা ছাড়া আর কি-ই বা করবার ছিল রতনবাঈ-এর? গোলাপ যে তার কথা শুনবে না। বিয়ে সে করবে না। তাহলে সারাটা জীবন তার কি ক'রে কাটবে? চারদিকের ভোগের আয়োজনে একলা কেন সে উপোসী থাকবে? শিখুক, গানই শিখুক

গোলাপ। গানে ডুবে থাকলে হয়তো অনেক দুঃখই সে ভুলতে পারবে। আহা, অমনি ওর কাঁচা বয়েস—

রতনবাঈ-এর কাছেই প্রথম শিক্ষা শুরু হলো গোলাপের। মা যেমন হাত ধরে শিশুকে দাঁড়াতে শেখায়, হাঁটতে শেখায়, রতনবাঈও ঠিক তেমনি ভাবে গোলাপকে গান শেখাতে আরম্ভ করল। অবশ্যি গানের গলা ছিল গোলাপের। সোনাক্ষেতে সোহাগী বৌদি, জুঁই বৌদি, সদি বোনের সঙ্গে সে গান গাইত। বিয়ের গান, মনসা পূজা'র গান। সেই গান শুনে পদ্ম-ঠাকুমা তাকে ঠাট্টা ক'রে বলতো, 'আহা, গলা হয়তো চিকন বাঁশী, প্রাণটারে যেন ছেদ করে দেয়।'

সেই চিকন বাঁশীর সুর আজও কণ্ঠে আছে গোলাপের। রতনবাঈও যেন হঠাৎ তা আবিষ্কার করল।

'আগে তুমি গান গাইতে?'

'না।

'অমন সাধা গলা, অমন মিষ্টি গলা।'

'বিয়ের গান গাইতাম।'

'কেউ গান শেখাতো না?'

'না।'

'ওঃ।' রতনবাঈ গোলাপকে গান আরম্ভ করতে বলল। গোলাপ 'আলাপ' শুরু করল।

গান গাইছে গোলাপ। রতনবাঈ শুনছে। মুগ্ধ হয়ে শুনছে। সুরের যে মায়াজাল সৃষ্টি করছে গোলাপ, রতনবাঈ বারে বারে সে জালে জড়িয়ে পড়ছে। সুরের শিহরনে তার মন কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। ফেলে আসা দিনের অনেক কথাই মনে পড়ছে তার। অনেক স্মৃতি ভিড় ক'রে আসছে তার চোখের সামনে। বড় মিষ্টি লাগছে সেই হারানো দিনগুলি। শিশু যেমন একটি মিষ্টি পেলে তা দেখে দেখে চেখে চেখে অনেকক্ষণ ধরে খায়, রতনবাঈও তেমনি তার হারানো দিনের স্মৃতিকে নানা দিক থেকে, নানাভাবে উপভোগ করছে।

হঠাৎ তানপুরার তান বন্ধ হলো। গান বন্ধ করল গোলাপ।

রতনবাঈ চোখ মেলল। বলল, 'কি, থামলে যে?'

গোলাপ প্রথমটায় কোন উত্তর দিল না।

রতনবাঈ আবার বলল, 'গান থামালে কেন?'

'তুমি কাঁদছো! তোমার চোখে জল!'

সত্যি, রতনবাঈ-এর চোখের কোল বেয়ে জল নেমেছে। কখন নেমেছে সে কথা নিজেই জানে না রতনবাঈ। গোলাপের কথায় তাই সে একটু লজ্জা পেল। মুখের বিরস ছায়াটিকে আড়াল ক'রে মুখে একটু হাল্‌কা হাসির আমেজ ফোটাল সে। বলল, 'কই, কাঁদি নি তো। কাঁদছি কোথায়? কাঁদবো কেন? কিসের দুঃখে কাঁদতে যাবো? গান থামালে কেন? নাও, আবার আরম্ভ করো। গান গাও।'

বলতে বলতে রতনবাঈ-এর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল ছলকে পড়ল। এবার আর সে তা মোছবার চেষ্টা করল না। হাসি দিয়ে সে তা আড়াল করারও চেষ্টা করল না। তবে তার মুখমণ্ডল হঠাৎ যেন গাম্ভীর্যে ভরে গেল। ধীরে ধীরে উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল রতনবাঈ যেন পালিয়ে গেল।

বিস্ময়ে গোলাপ সে দিকেই তাকিয়ে রইল। তার মুখে কোন কথা নেই।

আঠার

আর কিছু দেবার নেই রতনবাঈ-এর। সারা জীবনের সাধনায় যে ক'টি রত্ন সে আহরণ করেছিল তার সবই সে দিয়েছে গোলাপকে। তারই ঐশ্বর্যে গোলাপ আজ তিলোত্তমা। আর রতনবাঈ? গোলাপকে সব দিয়ে সে আজ নিঃস্ব—রিক্ত। ফুলদানির ঝরা ফুলের মতো। কোনদিন পুত্র-কন্যার মুখ দেখে নি রতনবাঈ। সে জন্যে তার মনের কূলে একটা গভীর তৃষ্ণা কেঁদে ফিরতো। গোলাপকে পেয়ে তার সে তৃষ্ণা মিটেছে। গোলাপের মধ্যে সে তার যৌবন-স্বপ্নের প্রকাশ দেখেছে।

ঠিক এমনি—এমনি একটি সন্তান চেয়েছিল রতনবাঈ। এমনি সুন্দর মুখ, গভীর চোখ আর মিষ্টি মন থাকবে যার। যাকে মন ভরে সাজাতে পারবে সে। প্রাণ ভরে গান শেখাতে পারবে।

গোলাপ তার সে সাধ পূর্ণ করেছে।

গোলাপকে সব সময়ই চোখে চোখে রাখে রতনবাঈ।

কারো সঙ্গে বড় একটা মিশতে দেয় না। কোথাও তাকে একলা যেতে দেয় না। এমন কি গানের আসরেও সে গোলাপের সঙ্গে সঙ্গে যায়।

লোকে হাসে। এ-কথা সে-কথা বলে।

কিন্তু রতনবাঈ কোন কথার পরোয়া করে না। মনে মনে বলে, 'লোকের কথায় কি হবে! লোকে কি বুঝবে! যে কলঙ্ক চিহ্নে আমার দেহ জর্জরিত, গোলাপের দেহে আমি সে কলঙ্ক চিহ্ন পড়তে দেবো না। না, না, কিছুতেই না। কিছুতেই না।' একটা দৃঢ় সংকল্পে রতনবাঈ-এর দুটি চোখের তারা যেন চকচক ক'রে ওঠে। কোন কোন দিন, হয়তো কোন দুর্বল মুহূর্তে সে গোলাপকে বলে, 'বড় একলা একলা লাগে, নয়?'

'তুমি আছো, আমার আবার একলা লাগবে কেন?'

'না, না, তবুও—বুঝলে না, তবুও।'

কিন্তু কথা বলতে যেয়েও যেন বলতে পারে না রতনবাঈ। মাঝখানেই

থেমে যায়। চোখ দুটি তার টলটল ক'রে ওঠে। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটাকে চেপে ধরে কি একটা আবেগকে যেন সে প্রতিহত করে।

গোলাপ এর কোন অর্থ খুঁজে পায় না। সে অবাক-দৃষ্টিতে রতনবাঈ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রতনবাঈ গোলাপের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। কপালে মাথায় হাত বুলায়। গোলাপের খোলা চুলের কয়েক পাট হাতে তুলে খেলায়।

বলে, 'আমি তোমাকে একলা রাখবো না, একলা রাখবো না। তোমায় আমি বড় করবো। মানুষ করবো। তোমার সুরের সম্মোহনে শুধু মানুষ নয়, বনের পশু-পক্ষীরাও ছুটে আসবে। তোমার গানে শুকনো ডালে ফুল ফুটবে। শুকনো আকাশে মেঘের সঞ্চার হবে। সে গান শেখাবার ক্ষমতা আমার নেই। সে গান আমি আয়ত্ত করতে পারি নি।'

'মা!'

'পারি নি মা, গুরুর কাছ থেকে সত্যি আমি তা নিতে পারি নি। হয়তো আমার সে সাধনা ছিল না, সে নিষ্ঠা ছিল না। কিন্তু আমার গুরুভাই ওস্তাদ পরমানন্দ।—'

'ওস্তাদ পরমানন্দ তোমার গুরুভাই?'

'আমাদের সুরের গুরু নারায়ণ রাও। তিনি এক জায়গায় থাকতেন না। সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিল তাঁর গানের আখড়া। বছরের এক এক সময়ে তিনি এক এক আখড়ায় থাকতেন। সে জন্যে তাঁর শিষ্যের দল সারা ভারতে ছড়ানো। ওস্তাদ পরমানন্দ থাকতেন লক্ষ্ণৌতে। অবশ্যি গুরুর সঙ্গে তিনি এখানে সেখানেও যেতেন। ঢাকায়ও এসেছেন কয়েকবার। আমার বাড়ীতেই উঠেছেন।'

'এ কথা তুমি তো আমায় আগে বলো নি মা?'

'প্রয়োজন হয় নি। আজ প্রয়োজন হয়েছে বলেই সে কথা তোমায় বলছি। ভাই পরমানন্দকে আমি চিঠি দিয়েছি। বোধ হয় তিনি ঢাকায় আসছেন!'

'কেন? হঠাৎ তাঁকে চিঠি দিতে গেলে কেন?'

'সে কথা পরে বলবো, আজ নয়।'

রতনবাঈ-এর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে গোলাপ এর একটা কারণ সন্ধান করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারে নি। রতনবাঈ-এর অটল গাম্ভীর্যের আড়ালে সে-কথাটি সে খুঁজে পায় নি।

রতনবাঈ উঠে গিয়েছিল।

মাসখানেক পরের কথা।

এক শ্রাবণ সন্ধ্যা। সকাল থেকেই আকাশটা মেঘলা ছিল। মাঝে মাঝে দু-এক পশলা বৃষ্টিও হয়েছে। তবে খুব জোরে নয়। কাজেই লোক চলাচলের বিরাম ছিল না। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই চারিদিক অন্ধকারে মুড়ে গেছে। কোন কিছুই দেখা যায় না। শুধু সামনে মোড়ের মাথায় মিউনিসিপ্যালিটির একটি গ্যাসের বাতি অন্ধকারকে জিব দেখিয়ে হাসছে।

একটি ঘোড়ার গাড়ী সেই বাতিটির কাছ দিয়ে এসে রতনবাঈ-এর বাড়ীর সামনে দাঁড়াল।

গাড়ীর ভেতর থেকে একটি পরিচিত কণ্ঠের ডাক শোনা গেল 'হরিচরণ।' হরিচরণের পাত্তা নেই। রতনবাঈ-এর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সে যেন কোন্ তাসের আড্ডায় গেছে।

কিন্তু ডাক শুনল রতনবাঈ নিজে।

ঘরে চলো, পরে কথা হবে।

এটা নিতান্তই পরমানন্দ, রতনবাঈ সংবাদ।

ওস্তাদ পরমানন্দ সেবার প্রথম ঢাকা এসেছে। গুরুর সঙ্গে। সৌম্য দর্শন, সুন্দরকান্তি তরুণ গায়ক।

রতনবাঈ-এর সঙ্গে সেই তার প্রথম সাক্ষাৎ।

গুরু নারায়ণ রাও তার বাড়ীতেই এসেছিল। বোধ হয় সেটা হেমন্তের অপরাহ্ণ। আকাশে তখন পড়ন্ত রোদ। রমনার এদিক সেদিক ছড়ানো আম গাছ ও গাব গাছগুলির মাথায় সেই রোদের চমক। কিন্তু ঐ গাছের মাথায়ই। গাছের মাথা গলে সে রোদ মাঠে এসে পড়ে নি। মাঠে তখন ছায়ার ওড়না মেলা।

নারায়ণ রাও বলেছিল, তোমার বাড়ীতে আজ নতুন অতিথি নিয়ে এলাম রতনবাঈ। রতনবাঈ হেসেছিল। সে হাসির তরঙ্গ উঠেছিল তার দুটি চোখেও। সেই অনুরাগেই বুঝি তার কপোল দুটি আরও লাল হয়ে গিয়েছিল।

বলেছিল, 'বেশ তো, নতুন অতিথিকে পেয়ে খুশি হলাম।'

'আর আমায় পেয়ে ?' হাসতে হাসতেই প্রশ্ন করেছিল নারায়ণ রাও। রতনবাঈ তার কোন জবাব দেয় নি। শুধু মাথাটা একটু নীচু ক'রে গুরুর চরণ ছুঁয়ে সে তাকে প্রণাম করেছিল।

সে রাতে আর বাসায় ফিরতে পারে নি নারায়ণ রাও। রতনবাঈ ফিরতে দেয় নি।

বলেছিল, 'বা-রে, এত-রাতে আপনাকে শুধু মুখে ছাড়লে লোকে আমায় ছিঃ ছিঃ দেবে না ? লোকের কাছে আমার মাথা কাটা যাবে না ?'

নারায়ণ রাও সে রাতে আর কোথাও যায় নি।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত গান চলেছিল।

নারায়ণ রাও নিজে গান গেয়েছিল। গান গেয়েছিল ভাই পরমানন্দ ও রতনবাঈও। বড় মিষ্টি গলা পরমানন্দের ! সে যখন গান গায় তখন একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। মনের গভীর থেকে সুরতরঙ্গ যেন নানা পর্দায় ধ্বনি তোলে। শ্রোতারা সহজেই মুগ্ধ হয়।

তাই পরমানন্দের গানে মুগ্ধ হয়েছিল রতনবাঈ। শুধু গান নয়, তার রূপেও। কতই বা তখন বয়েস হবে রতনবাঈ-এর। জোর বাইশ কি তেইশ। দেহের কানায় কানায় যৌবন উচ্ছল। চোখের দুটি কালো তারায় কি যেন একটা রহস্যের ছাপ।

নারায়ণ রাও বাইরে গেলে রতনবাঈ পরমানন্দকে বলেছিল, 'যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।'

'বলুন'—রতনবাঈ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিয়েছিল পরমানন্দ।

'যে ক'দিন ঢাকায় আছেন, আমার এখানেই থাকুন।'

পরমানন্দ একটু হেসেছিল। বলেছিল, 'বা-রে, আমি তার কি জানি। আপনি গুরুজীকে বলুন। তিনি মত করলেই আমার মত।'

'আপনিই গুরুজীকে বুঝিয়ে বলুন।'

'সেটা কি ভালো দেখাবে ?' বলতে বলতে রতনবাঈ-এর চোখের দিকে চেয়ে আবার হাসল পরমানন্দ।

রতনবাঈ বলল, 'গুরুজীকে বলেছিলাম। তিনি মত করলেন না। বললেন, থাকার মধ্যে কি আছে ? তোমার এখানে মাঝে মাঝে আসবো। তা হ'লেই তো হবে।'

'আমারও তা হ'লে ঐ কথা। মাঝে মাঝে আসবো। মাঝে মাঝে দেখা হবে।'

নারায়ণ রাও ফিরে আসায় এ প্রসঙ্গ আর অগ্রসর হয় নি।

নারায়ণ রাও সেবার বেশ কিছুদিন ঢাকায় ছিল। ঢাকায় তার ভক্তের সংখ্যা অনেক। প্রত্যেকের দাবিপূর্ণ করতে যেয়ে নারায়ণ রাওকে মাস দুয়েকই ঢাকায় থাকতে হলো।

এর জন্যে সব চেয়ে বেশী খুশী হলো বুঝি রতনবাঈ।

ওস্তাদ পরমানন্দ মাঝে মাঝে তার ওখানে যেত। কখনো একা। কখনো গুরুর সঙ্গে।

রতনবাঈ পরমানন্দকে কাছে পাবার সুযোগ পেয়েছিল।

কিন্তু তাকে বাঁধতে পারে নি রতনবাঈ। (পৃথিবীতে এক শ্রেণীর মানুষ থাকে যারা মিললেও মেশে না। জলে নামলেও জলে ডোবে না।) পরমানন্দ ছিল সেই জাতের মানুষ। তাই রতনবাঈ-এর ছড়ানো জালকে কেটে বেরিয়ে যেতে তার অসুবিধে হলো না।

সেদিনটা ছিল পূর্ণিমার রাত। কিন্তু রাত এখনও বেশী হয় নি। সবে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় রমনার এ দিকটা ঝিলমিল করছে। বাতাসে মালতী ফুলের গন্ধ।

রতনবাঈ একাই ছিল।

বারান্দার রেলিঙে হাত দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

পরমানন্দ চুপি চুপি তার পিছনে এসে দাঁড়াল। পিঠে হাত রাখল। চমকে উঠল রতনবাঈ। এতক্ষণ যে ধ্যানে সে মগ্ন ছিল সে ধ্যানের সূত্র যেন ছিঁড়ে গেল।

রতনবাঈ ফিরে তাকাল।

পরমানন্দ বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অত কি ভাবছিলেন?'

'ভাবছিলাম? ভাবছিলাম তোমাকে!'

'আমাকে? হঠাৎ?'

'হঠাৎ কেন হবে? যে দিন থেকে তোমায় দেখেছি'—কথা শেষ করতে পারল না রতনবাঈ। পরমানন্দ তার কথার মোড়কে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

বলল, 'ক'দিন ধরে আপনার শরীর ভালো নেই, নয় ?'

'আমার শরীর খারাপ হয় না।'

'তবে।'

হঠাৎ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল রতনবাঈ। যে কথাগুলি বাইরে বেরোবার জন্যে এতক্ষণ আকুলি-বিকুলি করছিল, সেগুলি যেন হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এল। পরমানন্দের মুখের দিকে দুটি জলভরা চোখ তুলে ধরে রতনবাঈ বলল, 'তুমি পাষাণ, তুমি পাথর, তোমার মন নেই, হৃদয় নেই। তোমার কিছুই নেই। তুমি কিছুই বোঝ না।'

রতনবাঈ রেলিঙের উপর মাথাটা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। পরমানন্দের ঠোঁটে একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলেও তার দুটি চোখ যেন জলে ভরে এল। রতনবাঈ-এর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'আমার হৃদয়-মন সবই আছে দিদি, নেই শুধু সে হৃদয়-মনের অধিকার। এ জীবনে সংগীতকে আমি ভালো বেসেছি, আর কিছু যে আমার ভালোবাসতে নেই। গুরুজীর কাছে যে আমি সেই প্রতিজ্ঞাই করেছি।'

রতনবাঈ-এর কান্না আরও যেন বেড়ে গেল।

পরমানন্দ বলল, 'তোমার এখানে প্রথম যেদিন আসি সেদিনই তোমার মন বুঝেছিলাম। ভেবেছিলাম, একটা গভীর তৃষ্ণা তোমার দুটি চোখে জ্বলছে। জীবনে কোনদিনই তুমি যা পাও নি, সে অধিকার তুমি আমার কাছ থেকে পেতে চাও। দুঃখ হয়েছিল এই ভেবে যে সব কিছু দিয়ে যে কাঙাল হয়েছে, সে কি দেবে তোমাকে? কি-ই বা তার দেবার আছে?'

বলতে বলতে পরমানন্দের গলাটা যেন ধরে এল।

এবার মুখ তুলল রতনবাঈ। জলের ধারায় দুটি কপোল তার ভিজে গেছে। ক'টি অগুছালো চুল ফুরফুরে হাওয়ায় উড়ছে। ধীরে ধীরে সে পরমানন্দের আরও একটু কাছে এগিয়ে এল। তার চোখের উপর দুটি জলভরা চোখ তুলে ধরল। তারপর পরমানন্দের ডান হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'তা হলে কথা দাও!'

'কি!'

'আমি যখন ডাকবো, তখন আমার কাছে আসবে তুমি।'

'আসবো, কথা দিলাম, আসবো।'

মেঘের বুকে সূর্যকিরণ পড়ে যেমন রামধনুর সৃষ্টি করে, রতনবাঈ-এর জল-ভরা চোখে একটা খুশী তেমনি যেন সাত রঙে রঙীন হয়ে উঠল।

খেতে খেতে দু'জনের কথা হলো।

বৃষ্টি এখনও থামে নি। সারা রাতে থামবে বলেও মনে হয় না। আকাশটা যেন মুখ ভারি ক'রে আছে। মাঝে মাঝে একটা বিদ্যুৎ তাঁর গালে যেন আঁচড় কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে গমগম ক'রে।

রাত এখন বোধ হয় দশটা।

পরমানন্দ বলল, 'হঠাৎ কেন তলব করলে সে কথা তো এখনও বললে না দিদি?'

রতনবাঈ নিজেই পরিবেশন করছিল। মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলল, 'কেন, এমনিতেই কি আর ডেকে আনা যায় না?'

'তা যাবে না কেন?'

'তবে মনে করো, আমি এমনিই ডেকেছি।'

'না, সে মানুষ তুমি নও।'

'তাই নাকি?' বলে রতনবাঈ হাসল। এই হাসিটুকুর আড়ালে যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে তা বুঝতে পরমানন্দের যেন বিলম্ব হলো না।

কি ভেবে যেন সে প্রশ্ন করল, 'গোলাপ তোমার কে, সে কথা তো সে সময় বললে না দিদি?'

'আমার মেয়ে।'

'তোমার মেয়ে?' একটা বিস্ময়ের সুর পরমানন্দের কণ্ঠে।

'হ্যাঁ।'

'কই, এ কথাতো আমায় কোন দিন জানাও নি?'

'সব কথা কি আর সব সময় সবাইকে জানানো যায়?' বলেই রতনবাঈ আবার ফিক্ ক'রে হেসে ফেলল।

পরমানন্দ বলল, 'এ শুভ সংবাদটুকুও নয়?'

'না, ওটুকুও নয়?'

'কেন?'

'সে 'কেন'র তো উত্তর নেই দাদা।'

পরমানন্দ এবারে কথা বলল না। মুখ বুজে মাথা নীচু ক'রে সে খেয়ে

চলল। বাইরে বৃষ্টিটা জোরে নেমেছে। জলের ছাট আসছে ঘরে। রতনবাঈ গিয়ে পশ্চিমের জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এল। জানালা বন্ধ করতে গিয়ে তার মুখে চোখে খানিকটা জল লাগল। শাড়ীর আঁচলে মুখটা মুছতে মুছতে সে আবার এসে পরমানন্দের কাছে বসল।

বলল, 'আর দু'খানা লুচি দিই ?'

'না।'

'কেন ?'

'সব 'কেন'র তো উত্তর দেওয়া যায় না।'

'ওঃ' বলে আবার ফিক্ ক'রে হেসে ফেলল রতনবাঈ। বুঝল, তারই অস্ত্রে তাকে ঘায়েল করেছে পরমানন্দ। এ আঘাত তার ভালোই লাগল। এ আঘাতের সঙ্গে অভিমানের উত্তাপ জড়ানো।

বলল, 'কেন, রাগ হলো বুঝি ?'

পরমানন্দ জবাব দিল না।

রতনবাঈ তার পাতে দু'খানা লুচি দিয়ে বলল, 'দেখো, আমার উপর রাগ করতে যেয়ে সারা রাত আবার খিদেয় জ্বলে মরো না।'

পরমানন্দ মাথা গুঁজেই উত্তর দিল, 'আমার বয়ে গেছে কারো উপর রাগ করতে ! কেন, রাগের কি আছে ? আমি আবার রাগ করতে যাবো কেন ?'

রতনবাঈ হাসতে হাসতে তার পাতে আরও দু'খানা লুচি ফেলে দিল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শোবার ঘরে এসে বসেছিল পরমানন্দ। ক'দিন শরীরের উপর দিয়ে খুবই ধকল গেছে। দেহ-মন ক্লান্ত। অবসন্ন। ঘুমের আমেজে চোখ দুটি যেন জড়িয়ে আসছে। কিন্তু ঘুম আসছে না।

রতনবাঈ এসে তার পাশে বসল।

হাত দিয়ে অগুছালো বিছানার চাদরটিকে পাট করতে করতে বলল, 'খুব রাগ হয়েছে বুঝি ?'

'না।'

'তুমি 'না' বললেই বুঝি আমি তা বিশ্বাস করলাম ?'

'বিশ্বাস করো না করো সে তোমার ইচ্ছে।'

'ইস্, তাপ যে এখনও কমে নি ! দেখো, সে তাপে আমার কথাগুলি আবার খই হয়ে ছিটকে না বেরোয়।'

পরমানন্দ একবার রতনবাঈ-এর মুখের দিকে তাকিয়েই আবার তার চোখ দুটি নামিয়ে নিল।

রতনবাঈ তার আরও একটু কাছে এল। কাছে আসতে গিয়ে তার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে গেল।

বলল, 'আমি যা বলেছি, আর তুমি তার সবই বিশ্বাস করেছো দাদা? জানো না, আমি বাঈজী, আমার সন্তান থাকতে নেই। পেটে আমার সন্তান ধরা পাপ?'

বলতে বলতে রতনবাঈ-এর দু'চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ ক'রে জলের ধারা নেমে এল।

পরমানন্দ আবার তাকাল রতনবাঈ-এর মুখের দিকে। দেখল, রতনবাঈ এখন যেন আর রতনবাঈ নয়, সে যেন ক্ষুধার্ত মাতৃত্বের মূর্তিময়ী প্রতিমা। একদিন তার চোখে মা হবার স্বপ্ন ছিল। তারই কাছে সে সন্তান চেয়েছিল। কিন্তু পরমানন্দ তাকে তা দিতে পারে নি। পারে নি বলে তার দুঃখও আজ কম নয়। সেই দুঃখে তার সব রাগ, সব অভিমান গলে জল হয়ে গেল।

বলল, 'তবে?'

'গোলাপ আমার নিজের মেয়ে নয়, সে আমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। ভগবান তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

রতনবাঈ সব কথাই খুলে বলল পরমানন্দের কাছে। সে কাহিনী শেষ হলে পরমানন্দের দু'খানি হাত জড়িয়ে ধরে রতনবাঈ আবার বলল, 'আমার যা ছিল, তার সবই ওকে দিয়েছি দাদা, দিয়ে আমি ফতুর হয়েছি। এবারে ওকে তোমার শ্রীচরণে সঁপে দিলাম। তুমি ওকে যা করবার করো।'

পরমানন্দ বলল, 'কিন্তু কাজটা কি ভালো হবে দিদি?'

'কেন?'

'সে প্রশ্নের উত্তর আবার আমার কাছে জিগ্যেস করছো?'

'ওঃ, এ পথে লোভ, এ পথে লালসা। এ পথে পদে পদে স্খলন-পতনের সম্ভাবনা—তাই নয়?'

পরমানন্দ মাথা নাড়ল।

'ও দিক দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো দাদা, গোলাপ আমার অনেক আগুনে পোড়া সোনা, বাইরের কোন দাগই ওর গায়ে লাগবে না।'

দিন সাতেক পরের ঘটনা।

বেলা এখনও খুব বেশী হয় নি। বড় জোর এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা। পল্টনের ভিজে মাঠে ভিজে গাছে রোদের যেন ছড়াছড়ি। ক'দিন বৃষ্টির পর আজ প্রসন্ন আকাশ। নীল আকাশের, সবুজ মাঠের পটভূমিকায় আজকের রোদ যেন সোনার মতো উজ্জ্বল।

একখানি গাড়ী ফটকে লাগল। হরিচরণ তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে বাক্স-পেঁটারা সব তার পিছনে চাপিয়ে দিল। একটু পরেই তাতে এসে বসল পরমানন্দ ও গোলাপ। রতনবাঈও এল সঙ্গে-সঙ্গে। তার দু'চোখ ছলছল। মুখমণ্ডল লাল। তার হৃদয়ে যেন একটা প্রচণ্ড ভূকম্পন শুরু হয়েছে।

(মানুষের স্বভাবটাই বুঝি এমনি। যাকে আমরা ভালোবাসি, আমরা যার কল্যাণ চাই, সে যখন সমুখ পানে অগ্রসর হয়, তখন আমরা তাকে নিজের কাছে আটকেও রাখতে চাইনে, অথচ তাকে বিদায় দিতেও আমাদের বুক ফাটে।)

রতনবাঈ-এরও আজ সেই অবস্থা।

সে গাড়ীর কাছে এসে গোলাপকে জড়িয়ে ধরে একেবারে হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল। পরমানন্দের দু'খানি হাত ধরে বলল, 'আমার সবচেয়ে বড় ধনকে আজ তোমার হাতে সঁপে দিলাম দাদা, এ ধনকে তুমি চোখে চোখে রেখো। কথা দাও, একে তুমি তোমার নিজের মেয়ে বলে মনে করবে?'

অনেক দিন পর পরমানন্দ আবার বলল, 'কথা দিলাম।'

এবারে রতনবাঈ-এর মুখমণ্ডল যেন জ্বলজ্বল ক'রে উঠল। মেঘের বুকে সূর্যরশ্মি পড়লে যেমন সাতরঙা রামধনুর সৃষ্টি হয়—রতনবাঈ-এর জলভরা চোখে একটা খুশীর দ্যুতি ঠিক সেইভাবে যেন জ্বলে উঠল।

পরমানন্দ বলল, 'তা হলে আসি দিদি?'

'এসো! এসো!'

বলতে বলতে রতনবাঈ আবার আঁচলে চোখ মুছল। গাড়ীটি রাস্তায় একটা ধূলি-চক্র সৃষ্টি ক'রে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উনিশ

রসিক দত্তের কাছে আরও একদিন গিয়েছিলাম।

বলেছিলাম, 'গোলাপের কথা আর তো বললে না দাদু?'

আমার কথা শুনে হেসেছিল রসিক দত্ত। দু'হাত দিয়ে দুটি চোখকে কেন যেন বার বার মুছে নিয়েছিল।

বলেছিল, 'কি-আর বলবো রে? বলে বলে সবই তো শেষ করেছি। সব কথাই আমার ফুরিয়ে গেছে। নতুন কিছু যে বলবার নেই।'

একটু থেমে আবার শুরু ক'রেছিল, 'আমার কথাটি ফুরল। নটে গাছটি মুড়ল। বুঝলি রে, আমার কথাটি ফুরল।' বলেই আবার হোহো ক'রে হেসে উঠেছিল সে।

আমি বলেছিলাম, 'কিন্তু সেই গোলাপ কি ক'রে যে পান্নাবাঈ হলো সে কথা তো কোনদিন শোনালে না আমাদের?'

'ও, তা শোনাই নি বুঝি?'

'না, সে কথা আর কবে শোনালে?'

'ওঃ, তা হ'লে যে সত্যি ভুল হয়ে গেছে পুঁটু, ভারি ভুল হয়ে গেছে। তবে যা, চট ক'রে তামাক নেজে আন, শেষ কথাটুকু এবারে শেষ করি। কিন্তু তার আগে বুদ্ধির গোড়ায় ধুঁয়া দিতে হবে তো রে।' বলতে বলতে রসিক দত্ত একটু নড়ে-চড়ে বসল। তার দুটি চোখ হঠাৎ একবার উজ্জ্বল হয়েই আবার যেন জলে ভরে এল।

আমি তামাক সাজতে গেলাম।

বাইরে বর্ষা নেমেছে। গাছ-গাছালির মাথাগুলি বৃষ্টির তালে তালে নাচছে। রাস্তাঘাট জল থৈথৈ। পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সেই জলে কচুপাতার নৌকা বানিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে। আর মাঝে মাঝে কি যেন বলাবলি ক'রে হেসে উঠছে।

রসিক দত্ত জানালা দিয়ে সে দিকেই তাকিয়ে ছিল।

আমি তামাক নিয়ে কাছে গেলাম। রসিক দত্ত খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল। কি দেখল তা সে-ই জানে। তারপর হুঁকোটি হাতে নিতে নিতে ডাকল, 'পুটু!'

'দাদু।'

'বড় হয়ে গোলাপের কথা নিয়ে একখানি বই লিখিস ভাই। কত লোকে কত কথা নিয়ে তো বই লেখে। লেখকের হাতের যাদুতে কত ব্যর্থ প্রেম তো অমর হয়ে থাকে। গোলাপকে নিয়ে তুই একটা কিছু লিখিস। জীবনে সে পেয়েছিল শুধু ব্যথা আর ব্যর্থতা। বিধাতা বুঝি ঘন কালো কালিতে তার কপালের লেখাগুলি লিখেছিলেন। তাই তার সারাটা জীবনই কলঙ্কের কালিতে কালো হয়ে রইল। অনেক কিছুর মধ্যে থেকেও জীবনে সে কিছুই পেল না। প্রাচুর্যের মধ্যে বাস ক'রেও সারাটা জীবন তার উপোস ক'রে কাটল। বড় হয়ে সেই উপবাসী হৃদয়ের বেদনাকে তুই ভাষা দিস ভাই। আমি জানি, সেটা তুই পারবি। সে ক্ষমতা তোর হবে।' বলতে বলতে রসিক দত্তের চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু আজ আর তা লুকোবার চেষ্টা করল না রসিক দত্ত। বলল, 'বড় জ্বালা রে পুটু, এ জীবনে বড় জ্বালা। সারা জীবন সেই জ্বালায়ই জ্বলে পুড়ে ম'লাম। খাক হয়ে গেলাম। এ পৃথিবীর কেউ তা জানল না। কেউ তা বুঝল না। বে-সাদি করলাম। ঘর বাঁধলাম। লোকে জানল, গোলাপকে আমার জীবন থেকে চিরদিনের মতো বিদায় দিয়েছি, গোলাপকে আমি ভুলে গেছি। কিন্তু না রে পুঁটু, না। কিশোর বেলায় হৃদয়ে যে দাগ পড়ে সে দাগ এ জীবনে আর মোছে না। আমার জীবন থেকেও তা মুছল না। সেই দাগ হৃদয়ের গভীরে আজও দগদগ করছে।'

বলতে বলতে রসিক দত্ত হুঁকোতে টান মারল। হুঁকোর জল কল-কলিয়ে উঠল। কিন্তু ধুঁয়া বেরুল না। কোলকের আগুন নিবে গেছে।

হুঁকোটি সে হাত থেকে নামিয়ে রাখল।

আমি বললাম, 'আবার একটু আগুন নিয়ে আসি দাদু?'

'না। আজ এমনিতেই নেশা ধরেছে। তামাকের নেশার আর দরকার হবে না।' বলে রসিক দত্ত ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল।

আমি তার আরও একটু কাছ ঘেঁষে বসলাম। বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের লীলা শুরু হয়েছে।

ওস্তাদ পরমানন্দের সঙ্গে গোলাপ যেদিন লক্ষ্ণৌ যায় সেদিন তার গভীর দুটি চোখও জলে ভরে উঠেছিল। বুকের তলায় বাজছিল কি একটা গভীর বেদনা। সোনাক্ষেতের কাছে থেকে সে ভেবেছিল সোনাক্ষেতকে সে ভুলে যেতে পারবে। কিন্তু আজ যখন দূরে যাবার ডাক এল, তখন সে দেখল, সোনাক্ষেত যেন তার হৃদয়ের সবগুলি নাড়ীকে টেনে ধরেছে। হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত না করলে সে আকর্ষণ কাটানো যায় না।

কিন্তু সে আকর্ষণকে কাটাতে হলো গোলাপের। হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করতে হলো।

পরমানন্দ বলল, 'খুব খারাপ লাগছে, না মা ?'

পরমানন্দের কথায় চমকে উঠল গোলাপ। গোপনে কোন কাজ করতে যেয়ে মানুষ যদি ধরা পড়ে তখন তার যে অবস্থা হয়, গোলাপেরও যেন অনেকটা সেই অবস্থা হলো। সে তাড়াতাড়ি মনের ভাবটাকে লুকোতে যেয়ে বলল, 'কই না তো ?'

কিন্তু তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তার চোখ থেকে ক' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

পরমানন্দ তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তা একটু খারাপ লাগবে বই কি মা। কত দূরে চলেছো। আত্মীয়-স্বজন কেউ সেখানে নেই। একটু খারাপ লাগবে বই কি!'

এই সহানুভূতির কথায় গোলাপের চোখের জল যেন আরও বেড়ে গেল। পরমানন্দ বলল, 'মনটাকে একটু শক্ত করো মা, মন নরম হলে জীবনে অনেক দুঃখ পেতে হয়। মন করবে পাথর। যেন বাইরের সব দুঃখ সেখানে একবার ঠুন্ ক'রে বাড়ি খেয়েই আবার ঝরে পড়ে যায়।'

গোলাপ আঁচল দিয়ে দুটি চোখকে মুছে নিল।

লক্ষ্ণৌ এসেও ক'দিন একই ভাবে কাটল গোলাপের।

যে কথাটা সে ভুলে যেতে চায়, সেই কথাটাই যেন বার বার তার মনকে জড়িয়ে ধরে। গত দিনের ফেলে আসা কথারা পাখীর মতো যেন মনের আনন্দে গান গেয়ে ওঠে। সোনাক্ষেতের নদী, বন, মাঠ, ঘাট সব কিছু যেন ছবির মতো তার চোখের সমুখ দিয়ে উড়ে যায়। সরকারদের মণ্ডপ, হলধর ফকীরের 'গাথা', পদ্মঠাকুমার বাড়ী, সব—সব কিছুর কথাই তার

মনে পড়ে। আর মনে যেন তার আগুন ধরে যায়। রাতদিন সেই আগুনে জ্বলে মরে।

পরমানন্দ বুঝি বুঝতে পারে তা। আর তা পারে বলেই সে তাকে কাছে কাছে রাখে। বলে, 'নানা কথা ভেবে মন খারাপ করো না মা।'

গোলাপ কথা কয় না।

'জীবনের সব দুঃখ, সব ভাবনাকে গোবিন্দের চরণে নিবেদন করো। তাঁর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করো। এই আত্মসমর্পণ করার মধ্যেই পরম শান্তি।'

গোলাপ মাথা তোলে। এক জোড়া কান্নাভেজা চোখ তুলে সে পরমানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পরমানন্দ বলে, 'হ্যাঁ মা, যে মানুষ নিজের ভার বইতে পারে সে তা বয়ে যাক। কিন্তু যে তা পারে না, সে তা গোবিন্দের চরণে সঁপে দিক।'

গোলাপের কান্নাভেজা দুটি চোখ যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

পরমানন্দ বলে, 'আমরা গান করি। গান হলো আমাদের পুজোর মন্ত্র। এই মন্ত্রেই আমরা গোবিন্দের ভজনা করি। মীরাবাঈ যে মন্ত্রে তাঁর গিরিধারীলালের সেবা করতেন, আমাদের মন্ত্রও সেই একই মন্ত্র। এ মন্ত্রে একবার মন ভরলে, বাইরের কোন আঘাতই আর সেখানে বড় হয়ে বাজতে পারে না। কারণ সে আঘাতকেও আমরা চোখের জলে সোনা ক'রে গোবিন্দজীকে নিবেদন করি।'

গোলাপ পরমানন্দের কথার ইঙ্গিত বোঝে। বলে, 'সে গান আমায় শিখিয়ে দিন গুরুজী। আমি সব ভুলে থাকতে চাই। আমি সব ভুলে যেতে চাই।'

ওস্তাদ পরমানন্দকে গোলাপ আজকাল গুরুজী বলেই ডাকে।

পরমানন্দ বলে, 'শেখাবো মা, তোমাকে আমার গুরুর ঘরানা দিয়ে যাবো। যে রত্ন আমি কাউকে দিই নি, সে রত্ন দিয়ে যাবো তোমার হাতে। তুমি আমার মোতি পান্না, একদিন তোমার আলো চারদিকে ঠিকরে পড়বে।'

গোলাপ গুরুজীকে প্রণাম করে।

লক্ষ্ণৌতেই গোলাপের নাম হলো পান্নাবাঈ।

পরমানন্দ ডাকতো মোতিপান্না। সেই মোতিপান্নাই একদিন পান্নাবাঈ হয়ে দাঁড়াল।

আসরে আসরে নাম, পান্নাবাঈ, পান্নাবাঈ।

পথে পথে নাম, পান্নাবাঈ, পান্নাবাঈ।

পান্নাবাঈ-এর নাম লক্ষ্ণৌর সর্বত্র। সবার মুখে মুখে।

হ্যাঁ, পরমানন্দ তার কথা রেখেছে। নিজের সব সম্পদ দিয়েছে সে পান্নাবাঈকে। শিল্পী যেমন তিল তিল ক'রে তিলোত্তমা গড়ে তোলে, পরমানন্দও তেমনি নিজের রত্ন দিয়ে দিয়ে পান্নাবাঈকে রত্নময়ী গড়েছে।

পরমানন্দ বলেছে, 'গান গাইবে প্রাণ দিয়ে। নিজের মান রেখে। গানকে কোন দিনই বেণের পণ্যে পরিণত করো না মা। গানকে বেণের পণ্যে পরিণত করলে সে গান আর গান থাকে না।'

পান্নাবাঈ বলেছে, 'তবে? কেউ যদি গান শুনতে চায়, তাকে কি গান শোনাবো না গুরুজী?'

'শোনাবে, তা শোনাবে বই কি মা। গান হলো সঞ্জিবনী সুধা। এ সুধা পান করার জন্যে কেউ যদি আকুল হয়ে ওঠে, নিশ্চয়ই তার আশাপূর্ণ করবে। তবে একটা কথা মনে রেখো মা, গান গাইবে নিজের খুশীতে, কারো হুকুমে নয়।'

না, কারো হুকুমে গান করে না পান্নাবাঈ। মনের খুশীতেই সে গান গায়। তার বাড়ীতে মাঝে মাঝেই শ্রেষ্ঠীকুলের আগমন হয়। অনেক ইনাম গড়িয়ে পড়ে তার পায়ের তলে।

পান্নাবাঈ একবার সেদিকে ফিরেও তাকায় না।

সেবার ঢাকার জীবন রায় এল লক্ষ্ণৌতে।

রসিক-মানুষ জীবন রায়। সারাটা জীবন সে গান-বাজনা নিয়েই কাটিযে দিল। লোকে বলতো, 'সংগীত সাধক। গানের নামে মানুষ যে এমন পাগল হয় তা আর কোথাও শুনি নি।'

হ্যাঁ, জীবন রায় সমঝদার মানুষ। গানের নামে নেচে ওঠে। দেশ-বিদেশের গায়কদের সে তার নাচঘরে ডেকে আনে। গান শোনে। তারই দানে অনেক শিল্পীর সংসার চলে।

সেই জীবন রায় এল লক্ষ্ণৌতে। পান্নাবাঈ-এর গানে সে মুগ্ধ হলো।

একদিন তাকে বলল, 'বাঈজী!'

পান্নাবাঈ-এর বাড়ীতে এসেছিল জীবন রায়। কৃতজ্ঞতা জানাতে।

বাইরের ঘরে বসেছিল। একটু দূরেই মাদুরে বসেছিল পান্নাবাঈ। সাজসজ্জা নেই। একটি সাধারণ শাড়ী পরনে। একটু আগেই হয়তো স্নান ক'রে উঠেছে। ভিজে চুল তাই পিঠময় ছড়ানো।

জীবন রায় ডাকল, বাঈজী!'

'বলুন।'

'একটু যে মেহেরবানি করতে হবে বাঈজী!'

পান্নাবাঈ শান্ত। ধীর স্থির। একবার সে তার গভীর দুটি দৃষ্টি জীবন রায়ের মুখের উপর ফেলেই আবার তা নামিয়ে নিল।

বলল, 'বলুন, আমায় কি করতে হবে!'

'আমার বাড়ীতে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে।'

'আপনার বাড়ী, মানে ঢাকায়?'

'হ্যাঁ, বাঈজী!'

ঢাকার কথা মুখে আনতেই সারাটা মুখ যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল পান্না-বাঈ-এর। দুটি গভীর চোখ হঠাৎ যেন টলটল ক'রে উঠল। যে ব্যথাটা মনের তলায় এতদিন সে থিতিয়ে রেখেছিল, আজ একটু নাড়া পেতেই সে যেন আবার উপরে ভেসে উঠল।

বলল, 'ঢাকা? ঢাকা তো আমার যাওয়া হবে না বাবু?'

'সে কি বাঈজী!'

'না, আমার শরীর ভালো নেই।'

'আগে শরীর ভালো হোক, তারপর—

জীবন রায় কথা শেষ করতে পারে নি। পান্নাবাঈই কথা কেড়ে নিয়েছিল। বলেছিল, 'হ্যাঁ, তারপরই আপনি খোঁজ নেবেন।' বলে আর অপেক্ষা করে নি পান্নাবাঈ। অপেক্ষা করতে পারে নি। চাকরকে পান তামাক দেবার হুকুম দিয়ে সে ভেতরে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু ভেতরে গিয়েও মনের ঝড় থামে নি পান্নাবাঈ-এর। বরং সে ঝড়ের বেগ দ্বিগুণ বেড়েছিল। প্রায় ষোল বছর হলো ঢাকার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। এই ষোল বছরে অনেক ঘটনা ঘটেছে। রতনবাঈ গেছে। ওস্তাদ পরমানন্দ গেছে। পান্নাবাঈ-এর জীবনে অনেক নতুন ঘটনা জড়ো হয়েছে। অনেক ঐশ্বর্যের মুখ দেখেছে সে। কিন্তু ঢাকার কথা সোনাক্ষেতের কথা সে ভুলতে পারে নি। কখনো-সখনো সে

স্মৃতি মনের তলায় থিতিয়ে থাকলেও তা, উপরে উঠেছে। পান্নাবাঈকে পাগল করেছে।

জীবন রায়ের মুখে ঢাকার কথা শুনে আজও তেমনি হলো। ফেলে আসা জীবনের অনেক স্মৃতি পান্নাবাঈএর মনে জেগে উঠল। শুধু জেগে উঠল না, সে স্মৃতি নানাদিক থেকে ছোবল মেরে তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করল। তার অন্তরে চলল দুটি সত্তার দ্বন্দ্ব। গোলাপ আর পান্নাবাঈ-এর।

গোলাপ বলল, 'ঢাকা, ঢাকা যাবি না কিরে। ঢাকাই যে তোর সব। সেখানে গেলে হয়তো মনে মনে জ্বলে মরবি। কিন্তু সে জ্বলে মরাতেও তোর শান্তি।'

পান্নাবাঈ: 'না, যাবো না। যে দেশ আমায় দিল শুধু কলঙ্ক, দিল শুধু ব্যথা, আমি আর সে দেশের মুখ দেখবো না?'

গোলাপ: 'ছিঃ ছিঃ, ও কথা বলতে নেই পান্নাবাঈ। কে আর কাকে ব্যথা দিতে পারে। ব্যথা-বেদনা সবই যে বিধিলিপি।'

পান্নাবাঈ: 'আমি সে কথা মানি নে।'

গোলাপ: 'ও তোর অভিমানের কথা পান্নাবাঈ।'

পান্নাবাঈ: 'হয় তো তাই।'

গোলাপ: 'অভিমান ক'রে তোর রসিকদা'কে তুই ভুলতে পারবি?'

পান্নাবাঈ নিরুত্তর।

গোলাপ: 'কত দিন, কত বছর তাকে দেখিস্ নে বলতো? কেমন আছে তাও তোর জানা নেই।'

পান্নাবাঈ কথা কইল না।

গোলাপ বলল, 'পান্নাবাঈ, হযতো ভাবছিস্, ঢাকা গেলেই কি আর রসিকদা'র দেখা পাবি? ঢাকা থেকে সোনাক্ষেত যে অনেকটা দূরের পথ। রসিকদা' তো তোর জন্যে ঢাকায় এসে বসে থাকবে না!'

পান্নাবাঈ: 'না গোলাপ, আজ যে আমি পান্নাবাঈ। আমার জীবনে তো আর রসিকদা'র প্রয়োজন নেই। জীবনের কোন এক উতল সন্ধ্যায় মনে আমার যে দীপ জ্বলেছিল, সে দীপ যে আজ নিবে গেছে।'

গোলাপ: 'এই কি তোর মনের কথা পান্নাবাঈ? ও কি রে, কাঁদছিস্ কেন? চোখে তোর জল।'

পান্নাবাঈ নিরুত্তর।

গোলাপ : 'আমি তোকে চিনি রে, বাইরে যতই বেশ বদলে থাকিস্ না কেন, অন্তরে এখনও তুই সেই গোলাপ। সোনাক্ষেতের সেই গোলাপফুল! চল্ পান্নাবাঈ, ঢাকা গেলে হয়তো রসিকদা'র দেখা পাবি। হয়তো দেখবি, সদরঘাটের সেই পার্কটার এক কোণে বসে রসিকদা আনমনে নদীর দিকে চেয়ে আছে। হয়তো সদরঘাটের যে রাস্তাটা বাঙলাবাজারের মাথায় এসে ঠেকেছে ঠিক সেখানটার একটি বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রসিকদা কার জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। তার সঙ্গে তোর কথা কইবার প্রয়োজন নেই। শুধু দূর থেকে তাকে দেখে দু'চোখ তোর জুড়িয়ে আসবি।'

পান্নাবাঈ : 'গোলাপ ?'

গোলাপ : 'পান্নাবাঈ।'

পান্নাবাঈ : 'আমি তোর কে ?'

গোলাপ : 'তুই যে গোলাপেরই ছদ্মবেশ। তোর ঐ বাইরের বেশটি খুলে ফেললেই যে তোর সত্যিকার রূপ বেরিয়ে পড়বে। দেখবি, তুই যা নোস, তোকে তা-ই সাজতে হয়েছে। তুই যা পারবি নে, তুই তারই অভিনয় করে চলেছিস্। এভাবে কদ্দিন চলবে পান্নাবাঈ ?'

পান্নাবাঈ : 'যদ্দিন এ জীবন আছে।'

গোলাপ : 'না, না, তা হবে না। আমি তা হতে দেব না।'

পান্নাবাঈ : 'তবে ?'

গোলাপ : 'তোকে ঢাকা যেতে হবে। তোর ঢাকা যাওয়া চাই।'

পান্নাবাঈ : 'কিন্তু বাবা, মা তারা যদি আমার এরূপ দেখে তা হ'লে ?'

গোলাপ : 'কত দিন হয়ে গেল! কে কোথায় আছে কে জানে? হয়তো প্রাণেও বেঁচে নেই। কিংবা—'

পান্নাবাঈ : 'তুই চুপ কর গোলাপ। আমি তোর কথাই মেনে নিলাম। আমি ঢাকা যাবো।'

ক'দিন পরে জীবন রায় খবর নিতে এসে খুশী হয়ে দেশে ফিরল। পান্নাবাঈ ঢাকায় আসছে। ভারত বিজয়িনী পান্নাবাঈ।

যাকে দেখার এত সাধ তাকে দেখে এমন কেন হলো সে কথাটা নিজেও বুঝতে পারল না পান্নাবাঈ।

রসিকচন্দ্রকে বিদায় দিয়ে সে একেবারেই যেন ভেঙে পড়ল। মন চাইল যেন চীৎকার ক'রে বলে, 'ওগো, যেয়ো নাগো।। তুমি যেয়ো না। আমার হৃদয়ের ক্ষতটা একবার তুমি দেখে যাও। দেখে যাও একটি কচি লতা বাহু প্রসারিত ক'রে উঠতে যেয়ে কি করুণভাবে মাটিতে আছড়ে পড়েছে। জীবনে কি তার দুর্দশা!'

কিন্তু পারল না। কি একটা ভয়ে গলাটা যেন তার আটকে এল। একটা তীব্র বেদনায় বুকটা তার ভেঙে গেল। কিন্তু মুখে তবুও কথা ফুটল না।

জীবন রায় এল আরও রাতে। ডাকল, 'বাঈজী!'

ধড়ফড় ক'রে উঠে বসল পান্নাবাঈ।

চোখের জলে দুটি কপোল সিক্ত। কাজলটানা দুটি গভীর চোখ টুক-টুকে লাল।

বলল, 'আমি পারলাম না, আমি পারলাম না বাবুজী, আমি আমার কথা রাখতে পারলাম না।'

'কেন? এমন কেন হলো বাঈজী, শরীটা কি সত্যি—'

'না, না আমি ভালো আছি, বেশ ভালো আছি।'

'তবে?'

'আর আমায় কিছু জিগ্যেস করবেন না বাবুজী, আমি আর কিছু বলতে পারবো না।'

জীবন রায় ম্লান হেসে ফিরে গিয়েছিল।

ক'দিন পরেই চিঠি এল সোনাক্ষেতে। 'শ্রীযুক্ত বাবু রসিকচন্দ্র দত্ত মহাশয় পূজ্যপাদেষু'র সমীপে।

রসিকচন্দ্র মাঠেই বসেছিল। বেলা শেষ। ক'টি ছেলে ছুটোছুটি করছে। সরকার বাড়ীর মণ্ডপের মাথায় এক ঝাঁক পায়রা এসে বসেছে। পাড়ার ক'টি মেয়ে ফকীর বাড়ীর 'গাথা' থেকে বাসন মেজে ফিরল।

রসিক দত্ত আনমনে বসেছিল। গত কয় দিনে তার মনের উপর দিয়ে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। সেই ঝড়ের দাপটে সে ক্লান্ত।

সে ক্লান্তি তার মন থেকে দেহে এসেও লেগেছে। তাই তার দেহ-মন দুই-ই আজ অবসন্ন।

এমন সময় গাঁয়ের ডাকপিয়ন হোসেন আলী এসে কাছে দাঁড়াল। সেলাম ক'রে বলল, 'চিঠি আছে বাবু, রেজেষ্ট্রী চিঠি।'

'রেজেষ্ট্রী চিঠি? কোত্থেকে?'

হোসেন আলী বলল, 'কি জানি বাবু, বোধ হয় কলকাতা থেকে? কলকাতায় আপনার কে আছে বাবু?'

রসিক দত্ত কথা কইল না। হোসেন আলীর হাত থেকে চিঠিখানি নিয়ে একবার পাশের ঠিকানাটা দেখল।

এ্যাকনলেজমেণ্ট রসিদটিতে সই ক'রে তা হোসেন আলীর হাতে ফিরিয়ে দিল।

রসিদটি নিজের থলিতে রাখতে রাখতে হোসেন আলী আবার জিগ্যেস করল, 'কলকাতায় আপনার কে আছে বাবু? কোন আত্মীয় বুঝি?'

'হুঁ।'

বলেই রসিক দত্ত অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে গেল।

হোসেন আলী আবার সেলাম জানিয়ে অন্য পথে চলল। গাঁয়ের পিয়নের এর চেয়ে বেশী খোঁজ-খবর নিতে নেই।

চিঠি লিখেছে পান্নাবাঈ। কলকাতা থেকেই লিখেছে।

চিঠিটি খুলতে খুলতে রসিক দত্তের দুটি চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল। ফেলে আসা জীবনের অনেক ছবি যেন ফুটে উঠল সে জলের রেখায়। পান্নাবাঈ লিখেছে—

রসিক দা, আকাশে আজ মেঘ করেছে। আকাশটা আজ যেন উপুড় হয়ে পৃথিবীর কাছাকাছি এসেছে। চোখের জলের মতো দু'চার ফোঁটা বৃষ্টির জলও পড়ছে মাঝে মাঝে। একটি দোতলা বাড়ীর জানালায় বসে আছি। পশ্চিমে খোলা মাঠ। অনেক দূর দেখা যায়। সে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনটা যেন উদাস হয়ে আসে। আজ আমারও তাই হয়েছে রসিকদা। মনটা আজ যেন বড় কাতর হয়ে পড়েছে। আকাশের মতো আমার মনেও যেন মেঘ করেছে। আর দু'চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ছে। যেমনভাবে তোমাদের ছাদের ড্রেন দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো, অনেকটা সেই মতো।

রসিকদা, যাকে তুমি নিজ হাতে দূরে ঠেলে দিয়েছো, তার জন্যে আবার চোখের জল ফেললে কেন? যে মালা তুমি স্বেচ্ছায় ছিঁড়েছ, তার জন্যে

আবার কাতরতা কেন? তুমি কি জানো না, ভালোবাসা অনেকটা ফুলের সুরভির মতো। সে একবার উড়ে গেলে আর ফিরে আসে না। তুমি কি জানো না, নদীর পাড় একবার ভাঙলে সে পাড় আর জোড়া লাগে না? তবুও সেদিন ঢাকায় তুমি চোখের জল নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলে। আমার নাম ধরে ডেকেছিলে। আমি তোমার ডাকে সাড়া দিই নি। দিতে পারি নি। আমি জানি, তুমি ব্যথা পেয়েছো। কিন্তু তোমায় সে ব্যথা দিতে গিয়ে কত বড় ব্যথা যে আমি নিজে পেয়েছি, এক অন্তর্যামী ছাড়া তা আর কেউ জানে না।

রসিকদা, আমায় ক্ষমা করো। তোমায় দুটি পা ধরে আমি এ ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আশীর্বাদ করো, এ জনমে যে সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল, আর জনমে যেন তা পূর্ণ হয়। এ জনমে যে মালা গাঁথতে গিয়েও গাঁথা শেষ হলো না, আর জনমে যেন তা শেষ করতে পারি।'

রসিক দত্ত আর পড়তে পারছে না। দুটি চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ছে।

সেই জলে ভরা দৃষ্টি নিয়ে অনেক দিন পরে সে আবার তাকাল সরকার বাড়ীর মাঠের দিকে। ফকীর বাড়ীর 'গাথা'র দিকে, মজুমদারদের চকের দিকে।

আজ অনেক দিন পরে সে দিকে তাকাতে যেন ভালো লাগছে।